

ছেলেদের বিবেকানন্দ

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মজুমদার

ছেলেদের বিবেকানন্দ

ছেলেদের বিবেকানন্দ

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা-৯

প্রকাশক : শ্রীঅশোককুমার সরকার
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৫ চিন্তামণি দাস লেন
কলিকাতা-৯

মুদ্রক : শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
৫ চিন্তামণি দাস লেন
কলিকাতা-৯

সপ্তম মুদ্রণ : জুন, ১৯৬২

মূল্য : দুই টাকা

স্বীকৃতি

উদ্বোধন কার্যালয়ের কর্মাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী আত্মবোধানন্দ ও তথাকার অন্যতম কর্মকর্তা শ্রীমৎ স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দ মহারাজদ্বয়ের অনুগ্রহে আমরা এই গ্রন্থে মুদ্রিত ছবিগুলির সমুদয় ব্লক ব্যবহারের সুযোগ লাভ করিয়াছি। এতদ্ব্যতীত স্বামী বিবেকানন্দের হস্তলিপিসহ বালকচিত্তের উপযোগী করিয়া সমস্ত চিত্রগুলির নির্বাচন ব্যাপারেও তাঁহারা আমাদিগকে যে উপদেশ দিয়াছেন তাহাতেও আমরা প্রভূত উপকৃত হইয়াছি।

সূচীপত্র



স্বামী বিবেকানন্দ

বালক বিবেকানন্দ

পরাধীন আত্মবিস্মৃত ভারতবর্ষে স্বদেশপ্রেমিক সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব এক বিস্ময়কর ঘটনা। যে কালে মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী ঘরের ছেলেরা নিরীহ ভাল মানুষের মত ইস্কুল কলেজের পড়া মুখস্থ করিয়া পরীক্ষায় পাশ করিত এবং ওকালতী, ডাক্তারী বা সরকারী চাকুরী করাই জীবনের উচ্চাশা বলিয়া মনে করিত, সেই সময় যুবক নরেন্দ্রনাথ পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য হইয়া, ভারতের পদদলিত, দীনদরিদ্র ছোটলোক বলিয়া উপেক্ষিত জনসাধারণের উন্নতির জন্য নিজেকে উৎসর্গ করিলেন। তিনি ধন চাহিলেন না, মান চাহিলেন না, ভারতবাসীর হীনতা ও দুর্গতি মোচনের জন্য দেশ ও দশের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করিলেন।

একদিক দিয়া ইহা যেমন বিস্ময়ের, অন্যদিকে সর্ব জাতির মধ্যে সকল দেশে যুগে যুগে এই শ্রেণীর মানুষের আবির্ভাব বিস্ময়ের হইলেও অস্বাভাবিক নহে। রাজশক্তি, ধনী ও অভিজাত সম্প্রদায় যখন

সাধারণ লোককে পীড়ন করিতে থাকে, মানুষের সমাজ ও সভ্যতা যখন দুর্নীতিতে মলিন হইয়া উঠে, তখন বিবেকানন্দের ন্যায় মানুষ আসিয়া কল্যাণের পথ দেখান। অতীতকালে বুদ্ধদেব বা যীশুখৃষ্ট যাহা করিয়াছেন, আধুনিক যুগে বিবেকানন্দ তেমনি ভাবে দুঃখ তাপে ক্লিষ্ট বিপথগামী সমাজকে কল্যাণের পথ দেখাইয়া গিয়াছেন। এই কারণেই তাঁহাকে আমরা ভারতে নবযুগ প্রবর্তক বলিয়া বন্দনা করি।

লোকে কথায় বলে, মানুষের চিরদিন সমান যায় না। সুপ্রাচীন সভ্যতার জন্মভূমি ভারতের হাজার হাজার বৎসরের ইতিহাসে উত্থান পতনের কত কাহিনী! কিন্তু বৃটিশযুগে আমাদের অধঃপতন প্রায় চরম সীমায় আসিয়াছিল—আমাদের যে কি ছিল, আমরা যে কি ছিলাম, তাহা পর্যন্ত ভুলিতে বসিয়াছিলাম। অবস্থা এমন দাঁড়াইয়াছিল যে, পূর্বপুরুষদের গৌরবের জ্ঞানের মহিমার বীর্যের কোন চিহ্নই আমাদের মধ্যে ছিল না। এমনি সংকটের দিনে বিবেকানন্দ আসিয়া আমাদের জাতীয় মর্যাদা-বোধ জাগ্রত করিলেন। তিনি বুঝাইলেন, আমাদের প্রাচীন জ্ঞান বিদ্যা সংস্কৃতির সহিত আধুনিক বিজ্ঞানকে মিলিত করিতে পারিলে পৃথিবীর

অন্যান্য উন্নতিশীল জাতির মতই আমরা উন্নত হইব। তিনি বলিলেন, পরের (ইংরাজের) নকল করিয়া, পরের উপর নির্ভর করিয়া তোমরা বড় হইতে পারিবে না, দাসসুলভ দুর্বলতা ত্যাগ কর। নিজের দেশ ও দেশবাসীকে ভালবাস। নীচজাতি, মূর্খ দরিদ্র অজ্ঞ মুচি মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই। তিনি ভারতের তরুণদের ডাকিয়া বলিলেন—"হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই; বল, মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই। তুমি কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেব-দেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশু-শয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী; বল ভাই, ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ।"

এই স্বামী বিবেকানন্দ কলিকাতা সহরের শিমুলিয়া (শিমলা) পল্লীর এক স্বচ্ছল মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা বিশ্বনাথ দত্ত কলিকাতা হাইকোর্টের উকীল ছিলেন। বিশ্বনাথের পিতামহ রামমোহন দত্তও

সেকালের সুপ্রীম কোর্টের উকীল ছিলেন। ইনিই অর্থোপার্জন করিয়া দত্তবংশের খ্যাতি প্রতিষ্ঠা করেন। রামমোহনের পুত্র দুর্গাচরণও আইন ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি পঁচিশ বৎসর বয়সেই সন্ন্যাসী হইয়া পত্নী পুত্র গৃহ পরিজন ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। এই সন্ন্যাসীর পুত্র বিশ্বনাথই বিশ্ববিখ্যাত স্বামী বিবেকানন্দের জনক।

বিশ্বনাথ পারসী ও ইংরাজী ভাষায় সুশিক্ষিত ছিলেন। তিনি গোঁড়া হিন্দু ছিলেন না। বহু অভিজাত মুসলমান তাঁহার মক্কেল ছিলেন। ইঁহাদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিয়া এবং লক্ষ্ণৌ, দিল্লী, লাহোর প্রভৃতি অঞ্চল ভ্রমণ করিয়া তিনি আহারে বিহারে মুসলমানী আদব কায়দার অনুসরণ করিতেন। ধর্মমত বা ঈশ্বরীয় ব্যাপার প্রভৃতিতে তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল না। সেকালের অনেক শিক্ষিত নাগরিকের মত তিনি সন্দেহবাদী ছিলেন। অর্থোপার্জন করা এবং জীবনটাকে ভোগ করার একটা সাধারণ আদর্শে তিনি চলিতেন। যেমন উপার্জন করিতেন, তেমনি ব্যয় করিতেন। আত্মীয় বন্ধুবান্ধব, প্রয়োজনের অতিরিক্ত দাস দাসী, গাড়ী ঘোড়া লইয়া বেশ জাঁকজমকের সঙ্গে তিনি বাস

করিতে ভালবাসিতেন। স্বাধীনচেতা, উদার, বন্ধু-বৎসল, আশ্রিত-প্রতিপালক বিশ্বনাথ দত্তের স্বচ্ছল সংসারে অভাব ছিল না।

কিন্তু জননী ভুবনেশ্বরী ছিলেন প্রাচীনপন্থী হিন্দুমহিলা। কাজেই পূজা উৎসব, বারমাসে তের পার্বণে দত্তগৃহ মুখরিত থাকিত। স্বামীর মতই তিনি আত্মীয় ও আশ্রিতদের অকাতরে অন্নদান করিতেন। তিনি বাঙ্গলা লেখাপড়া ভালই জানিতেন, প্রত্যহ রামায়ণ মহাভারত পাঠ করিতেন। ক্রমে ক্রমে দুইটি কন্যার জননী হইবার পর তিনি পুত্রলাভের জন্য ব্যাকুলা হইলেন। প্রতিদিন শিবপূজা করিয়া পুত্রকামনায় প্রার্থনা করিতেন। শুনিয়াছি, একদিন রাত্রে তিনি স্বপ্ন দেখিলেন, যেন স্বয়ং মহাদেব আসিয়া তাঁহাকে আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, তোমার পুত্র হইবে। ইহার কিছুদিন পরই বিবেকানন্দের জন্ম হয়।

১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের ১২ই জানুয়ারী। সেদিন পৌষ-সংক্রান্তি। বাঙ্গলার ঘরে ঘরে পৌষ-পার্বণের আনন্দোৎসব। প্রভাতে ৬টার পর জননী ভুবনেশ্বরী এক সুন্দর শিশু প্রসব করিলেন। অন্নপ্রাশনের সময় বালকের নাম রাখা হইল শ্রীনরেন্দ্রনাথ। মা তাঁহার স্বপ্ন স্মরণ করিয়া নাম রাখিলেন, বীরেশ্বর।

এই বীরেশ্বর নাম হইতেই তাঁহার ডাক নাম হইয়াছিল 'বিলে'।

ছেলেবেলায় স্বামিজী খুব অশান্ত ও দুষ্ট ছিলেন। বাড়ীর সকলেই শিশুর অনাচারে বিরক্ত ও বিব্রত হইয়া উঠিত। ভুবনেশ্বরী অনেক সময় বিরক্ত হইয়া বলিতেন, "মহাদেব নিজে না এসে, একটা ভূত পাঠিয়েছেন।" বালককে শান্ত করিবার একটা উপায় খুব কাজে লাগিত। আবদার ধরিয়া কাঁদিয়া চীৎকার করিয়া অশান্ত নরেন্দ্র যখন কোন প্রবোধ মানিতেন না, তখন 'শিব' 'শিব' বলিয়া কয়েক ঘটী জল তাঁহার মাথায় ঢালিয়া দিলেই তিনি শান্ত হইয়া বসিতেন।

শিশু নরেন্দ্রনাথের ঘোড়ার গাড়ীতে উঠিলে আনন্দের সীমা থাকিত না। অনেক সময় নরেন্দ্র বাড়ীর সম্মুখে বসিয়া ঘোড়ার গাড়ী দেখিতেন। কোন তেজস্বী ঘোড়া দেখিলেই, তাঁহার মুখ চোখ আনন্দে ভরিয়া উঠিত। একদিন নরেন্দ্রের পিতা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "নরেন, তুমি বড় হলে কি হবে বল দেখি?" নরেন্দ্র তৎক্ষণাৎ গম্ভীরভাবে উত্তর দিয়াছিলেন, "ঘোড়ার সহিস কি কোচম্যান হব।" কোচম্যানদের বুক ফুলাইয়া চাবুক হাতে গাড়ী চালান এবং নানারঙের জরীর তক্‌মা দেওয়া

পোষাক দেখিয়া নরেন্দ্র অবশ্য কোচম্যানদের খুব সৌভাগ্যবান্ মনে করিতেন। সেই জন্যই তিনি গাড়ী চালান শিখিবার আশায়, পিতার বৃদ্ধ শকট-চালকের সহিত বন্ধুত্ব করিয়াছিলেন। সুযোগ ও অবসর মত আস্তাবলে গিয়া সহিস, কোচম্যানের কাজ দেখিতেন এবং তাহাদের সহিত গল্প করিতেন।

নরেন্দ্রের বাড়ীতে প্রায় প্রত্যহ দুপুর বেলায় মেয়েদের একটা বৈঠক বসিত। একজন বৃদ্ধা মহিলা মহাভারত কি রামায়ণ পড়িতেন, আর সকলে তাহা শুনিতেন। তিনি কখনো বা বই পড়িতেন, কখনো বা বিভিন্ন পুরাণের কাহিনীগুলি গল্প করিয়া শুনাইতেন। দুষ্ট নরেন্দ্রনাথ এই মহিলাসভায় শান্ত ভাবে বসিয়া থাকিতেন। শুনিয়া শুনিয়া রামায়ণ মহাভারতের অনেক গল্পই তাঁহার মুখস্থ হইয়া গিয়াছিল। কেবল তাহাই নহে, ভীম অর্জুন শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি বীরগণের কথা তাঁহার এত ভাল লাগিত যে, সমস্ত খেলাধুলা ছাড়িয়া ভাল মানুষের মত ঐ সব কথা শুনিতেন এবং রাত্রে মাকে ঐ সব গল্প শুনাইবার জন্য অনুরোধ করিতেন। সবচেয়ে তাঁহার ভাল লাগিত রামায়ণের সীতা-রামের কাহিনী আর হনুমানের রামের প্রতি ভক্তি। একদিন তিনি

বাজারে গিয়া একটি রাম-সীতার মূর্তি কিনিয়া আনিলেন। দোতালার ছাদে একটা ছোট ঘরে সেইটি রাখিয়া রোজ পূজা করিতেন।

তখনকার দিনে কথকতার খুব চল ছিল। গ্রামে গ্রামে কথকঠাকুররা পুরাণ কাহিনী সরস করিয়া বর্ণনা করিতেন। স্ত্রী-পুরুষ সকলেই ভক্তিভরে তাহা শুনিত। পাড়ায় কথকতা হইলেই নরেন্দ্র সেখানে উপস্থিত হইতেন এবং তন্ময় হইয়া শুনিতেন। একদিন রামায়ণের কথকতা শুনিয়া সরলবিশ্বাসী বালক ধীরে ধীরে কথকঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয় আপনি যে বলিলেন, হনুমান অমর, তিনি কলাবাগানে থাকেন আর কলা খাইতে ভালবাসেন, আমি কলাবাগানে গেলে তাঁহাকে দেখিতে পাইব? কথকঠাকুর রহস্য করিয়া বলিলেন, হাঁ খোকা, তুমি কলাবাগানে খুঁজিলে তাঁহাকে পাইবে। বালক নরেন্দ্র তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিয়া রাত্রে বাগানের এক কলাগাছের কাছে বসিয়া রহিলেন, কিন্তু হনুমান আসিলেন না। গভীর রাত্রে বাড়ীতে ফিরিয়া তিনি মায়ের নিকট সব কথা খুলিয়া বলিলেন এবং কাঁদ কাঁদ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মা, হনুমান কেন আসিলেন না? মাতা সন্তানের অগাধ বিশ্বাস দেখিয়া বলিলেন যে, তুমি দুঃখ

করিও না, আজ হনুমানকে রাম হয়তো কোন কাজে পাঠাইয়াছেন। আর একদিন দেখা হইবে।

পাঁচ বৎসর বয়সে নরেন্দ্রের হাতেখড়ি হইয়াছিল। বাড়ীতে গুরু মহাশয়ের নিকট বর্ণ-পরিচয় শেষ হইলে বিশ্বনাথবাবু তাঁহাকে মেট্রোপলিটান ইন্‌ষ্টি-টিউসানে পাঠাইয়া দিলেন। স্কুলে সমবয়স্ক খেলার সঙ্গীদের পাইয়া তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না। কয়েকদিনের মধ্যেই নরেনের নূতন বন্ধুদের খেলাধূলায় দত্তগৃহ প্রভাতে বৈকালে মুখরিত হইয়া উঠিল। স্কুলে গিয়া প্রথমে নরেনের বিপদও কম হয় নাই। তিনি একস্থানে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারিতেন না। এদিক ওদিক ছুটাছুটি করিতেন। শাসনে ভয় পাইবার ছেলে তিনি ছিলেন না—গালাগালি দিলে তিনি পড়া ছাড়িয়া বাঁকিয়া বসিতেন। কাজেই মিষ্ট কথায় তাঁহাকে ভুলাইতে হইত।

ছেলেবেলায় তিনি যে কত নির্ভীক ও সাহসী ছিলেন, সে সম্বন্ধে একটি দৃষ্টান্ত দিব। তখন তাঁহার বয়স ছয় বৎসর মাত্র। তিনি চড়কের বাজার হইতে একটি মহাদেবের মূর্তি কিনিয়া বাড়ী ফিরিতেছিলেন, এমন সময় তাঁহাদের দলের একটি ছেলে কোন কারণে ফুটপাথ হইতে রাস্তায় নামিয়া

পড়ে, ঠিক সেই সময় একখানি ঘোড়ার গাড়ী বেগে আসিতেছিল। ছোট ছেলেটি তাহার সম্মুখে গাড়ী দেখিয়া হতভম্ব হইয়া গেল, রাস্তার পথিকেরা চীৎকার করিয়া উঠিল, নরেন্দ্র পিছনে চাহিয়া দেখিলেন, ছেলেটি প্রায় ঘোড়ার পায়ের তলে পড়ে পড়ে। চকিতে মূর্তিটা বগলে ফেলিয়া তিনি ছেলেটিকে ঘোড়ার পায়ের তলা হইতে টানিয়া বাহির করিলেন। আর একটু দেরী হইলেই ছেলেটির কি হইত বলা যায় না। এতটুকু ছেলের এত সাহস দেখিয়া সকলেই অবাক হইয়া গেল। কেহ কেহ নরেন্দ্রকে কোলে করিয়া আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন। বাড়ীতে আসিলে তাঁহার মা আদরে গালে চুমা দিয়া বলিলেন, সব সময় এই রকম মানুষের মত কাজ করিও বাবা।

তাঁহার সাহসের আর একটা কথা বলি। যে সমস্ত বালক জুজু ও ভূতের কথা শুনিলে ভয় পায়, নরেন্দ্র তাহাদের মত ছিলেন না। তিনি ভূতের কথা শুনিলে ভূত দেখিতে চাহিতেন। নরেন্দ্রের প্রতিবেশী এক খেলার সাথীর বাড়ীতে একটি চাঁপা ফুলের গাছ ছিল। ঐ গাছের ডালে পা বাধাইয়া মাথা ও হাত ঝুলাইয়া দোল খাওয়া নরেন্দ্রের একটা প্রিয় খেলা ছিল। বাড়ীর বুড়াকর্তা নরেন্দ্রকে এক-

দিন ঐরূপ উঁচু ডালে দোল খাইতে দেখিয়া ভীত হইলেন। নরেন্দ্রের উৎপাতে গাছটির ভাঙিবার যথেষ্ট আশঙ্কা ছিল। তিনি নরেন্দ্রের স্বভাব জানিতেন। ধমক দিলে বিপরীত ফল হইবে, কাজেই মিষ্ট কথায় বলিলেন, দেখ নরেন, এ গাছটায় উঠো না। নরেন অমনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন, এ গাছে উঠলে কি হবে? বুড়া বলিলেন, ওগাছে একটা ব্রহ্মদৈত্য থাকেন। এই বলিয়া বুড়া ব্রহ্মদৈত্যের বিকট চেহারা বর্ণনা করিলেন এবং ব্রহ্মদৈত্য রাগিলে গাছ হইতে আছাড় মারিয়া ফেলিয়া দিবে, এমনি আরও কয়েকজনকে ফেলিয়া দিয়াছে এই সব ভয়ের কথা বুড়া বর্ণনা করিলেন। নরেন চুপ করিয়া শুনিতেছে দেখিয়া বুড়া মনে ভাবিলেন, তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু বুড়া চলিয়া যাইবামাত্র নরেন পুনরায় গাছের ডালে উঠিয়া বসিলেন। নরেনের খেলার সাথী যথেষ্ট ভয় পাইয়াছিল, সে আস্তে আস্তে বলিল, "নরেন, তোমার ভয় হচ্ছে না!" নরেন বলিলেন, "ব্রহ্মদৈত্য একবার দেখতে পেলে হয়।"

সাথী বলিল, "না ভাই, অপদেবতার কথা বলা যায় না, কোনদিক থেকে কখন যে ঘাড় মট্‌কে দেবে, তার ঠিক নেই।" নরেন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, "তুই

আস্ত বোকা, তোর ঠাকুরদাদা ভয় দেখাবার জন্য বানানো গল্প বলে গেলেন। যদি সত্য সত্য এই গাছে ব্রহ্মদৈত্য থাকতো, তা' হলে সে এতদিন নিশ্চয় আমার ঘাড় মট্‌কে দিত।"

লোকে যাহা বলিত, তাহাই তিনি বিশ্বাস করিতেন না। নিজে ভাল করিয়া বুঝিয়া পরে মানিতেন। ছেলেবেলার সাহস ও দুষ্টামির কথা বলিতে গিয়া স্বামিজী একজন শিষ্যকে বলিয়াছিলেন, "ছোটবেলা থেকেই একটা একগুয়ে দানা ছিলুম আর কি? নৈলে কি আর কপর্দকশূন্য অবস্থায় সমস্ত দুনিয়াটা ঘুরে আস্‌তে পারতুম রে?"

১৪ বৎসর বয়সের সময় নরেন্দ্র পেটের অসুখে ভুগিতে লাগিলেন। তাঁহার শরীর ভাঙিগয়া পড়িতে লাগিল। তখন বিশ্বনাথ মধ্যপ্রদেশের রায়পুরে ছিলেন। রায়পুর স্বাস্থ্যকর স্থান, এখানে আসিলে নরেন্দ্রের শরীর ভাল হইবে মনে করিয়া বিশ্বনাথ পরিবারবর্গ লইয়া আসিলেন।

১৮৭৭ সাল। চৌদ্দ বৎসরের কিশোর বালক নরেন্দ্র এই প্রথম কলিকাতা সহরের বন্ধন হইতে মুক্তি পাইলেন। তখন কলিকাতা হইতে রায়পুর হইয়া নাগপুর পর্যন্ত রেললাইন হয় নাই।

এলাহাবাদ হইতে জব্বলপুর হইয়া নাগপুর পর্যন্ত রেল। তারপর গোরুর গাড়ীতে পনর কি ষোল দিনে রায়পুর যাইতে হইত। এই দীর্ঘপথে অর্ধেক ভারতবর্ষ বেষ্টন করিয়া ভ্রমণের কি আনন্দ। রেল-পথের দুইধারে বিস্তীর্ণ প্রান্তর। গিরি অরণ্য সবই বিস্ময়ের। দেশজননীর বিচিত্র রূপে নরেন্দ্রের তরুণ মন ভরিয়া উঠিল। নাগপুর হইতে গো-যানে রায়পুরে যাইবার সময় বিন্ধ্যপর্বতের পাদদেশে অরণ্যের তরুলতা ফলফুলের শোভা দেখিতে দেখিতে নরেন্দ্র মুগ্ধ হইলেন। এই সময় তিনি দেখিলেন পাহাড়ের গায়ে এক বৃহৎ মৌচাক—শত শত মক্ষিকা ব্যস্ত হইয়া আনাগোনা করিতেছে। মক্ষিকা রাজ্যের সহিত বিশ্ব সংসারের তুলনা করিয়া গভীরভাবে তিনি তন্ময় হইয়া বাহ্যজ্ঞান হারাইলেন। পরে বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, ধ্যানে আত্মহারা হওয়ার তাঁহার জীবনে সেই সর্বপ্রথম অনুভূতি।

তখন রায়পুরে স্কুল ছিল না। কাজেই বিশ্ব-নাথ নিজেই পুত্রের শিক্ষার ভার লইলেন। তিনি নরেন্দ্রকে কেবল পাঠ্য পুস্তকের পড়া মুখস্থ করাইতেন না। আলোচনামুখে বাঙলা সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন প্রভৃতির কথা উঠিত এবং ঐ সকল

পুঁথি পুস্তক তিনি নরেন্দ্রকে পড়িতে দিতেন। বঙ্কিম, মধুসূদন, হেমচন্দ্র, রঙ্গলাল প্রভৃতি সাহিত্যিক ও কবির রচনাবলী তাঁহার কিশোর মনকে নূতন নূতন চিন্তা ও ভাবে অনুপ্রাণিত করিল। ১৪ বৎসরের বালকের মানসিক পরিণতি এবং আলোচনায় বুদ্ধির তীক্ষ্ণতার পরিচয় পাইয়া বিশ্বনাথ আনন্দিত হইলেন।

কলিকাতা সহরে বিষয়কর্ম লইয়া ব্যস্ত পিতার সহিত এতটা ঘনিষ্ঠভাবে নরেন্দ্র মিশিতে পারেন নাই। রায়পুরে দুই বৎসরে পিতার নিকট তিনি যে শিক্ষা লাভ করিলেন তাহাই তাঁহার ভাবী জীবনের বনিয়াদ রচনা করিল। যুক্তিপন্থী পিতার নিকট নরেন্দ্র এই শিক্ষা লাভ করিলেন, 'বিনা প্রমাণে কিছু মানিব না, বিচার বিবেচনা না করিয়া কিছুতে বিশ্বাস করিব না।' মুক্তহৃদয় দয়ালু পরদুঃখ-কাতর বিশ্বনাথের চরিত্রের সদ্‌গুণগুলিও নরেন্দ্রের মধ্যে সঞ্চারিত হইতে লাগিল। কিশোর বালকের ব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্যবোধ দানা বাঁধিতে লাগিল। রায়পুরে কয়েকমাসের মধ্যেই তিনি স্বাস্থ্যলাভ করিয়াছিলেন এবং নিয়মিত ব্যায়াম করিবার ফলে ষোল বৎসর বয়সে তাঁহাকে বিশ বৎসরের মত দেখাইত।

প্রায় দুই বৎসর পর নরেন্দ্র কলিকাতায় ফিরিলেন। মেধাবী ছাত্র নরেন্দ্রনাথকে মেট্রোপলিটান স্কুলের কর্তৃপক্ষ প্রবেশিকা শ্রেণীতে ভর্তি করিয়া লইলেন। ১৮৭৯ সালে নরেন্দ্র প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলেজে প্রবেশ করেন। সেকালে "ফার্ষ্টবয়" বলিয়া যে সব নিরীহ ভালমানুষ ছেলে লোকের প্রশংসা পাইত, নরেন্দ্র তাহা ছিলেন না। সেকালে ছাত্রদের গানবাজনা করা অতি গর্হিত অপরাধ ছিল, অথচ বিশ্বনাথ পুত্রকে উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত শিক্ষা দিয়াছিলেন। সেকালে স্কুলের ছাত্রদের 'নির্দোষ' খেলা ছাড়া কুস্তীর আখড়ায় ব্যায়াম করা 'গুন্ডামির' সমতুল্য ছিল, অথচ নরেন্দ্র বাল্যকাল হইতেই নবগোপাল মিত্রের বিখ্যাত আখড়ায় ব্যায়াম করিতেন। ফলে পাড়ার ভদ্রলোকেরা নরেন্দ্রের নিন্দা করিতেন, তিনি তাহা গ্রাহ্য করিতেন না। তাঁহার আত্মমর্যাদাবোধ মাঝে মাঝে উগ্রস্বভাব বলিয়া মনে হইলেও, তিনি সহপাঠী ও বন্ধুবান্ধবদের প্রিয় ছিলেন।

পিতামাতার স্নেহক্রোড়ে নরেন্দ্রনাথের বাল্য ও কৈশোর হাসি আনন্দ খেলাধুলায় কাটিয়াছে। জননীর শিক্ষায় ছেলেবেলা হইতে তাঁহার ধর্মানুরাগ ছিল। কিন্তু তাঁহার মধ্যে কোন কিছু

অলৌকিকত্ব ছিল না। তিনি এমন কিছু অসাধারণ ছিলেন না। বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত শিক্ষিত পরিবারের আর দশ জন বালকের মতই তিনি লালিত পালিত বর্ধিত হইয়াছেন। তবে ছাত্রজীবন হইতেই তাঁহার জ্ঞানপিপাসা ছিল।

তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পূর্বেই সাহিত্য ইতিহাস দর্শন বিজ্ঞানের ভাল ভাল বই পাঠ করিতেন। বুদ্ধিমান তেজস্বী নরেন্দ্রনাথ বাল্যকাল হইতেই নিজেকে অন্যান্য অনেকের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করিতেন। উহা অহঙ্কার নহে—নিজের প্রতি বিশ্বাস। মানুষ হইয়া জন্মিয়াছি যখন, তখন একটা বড় কিছু করিব, ইহাই ছিল তাঁহার সঙ্কল্প। এই সঙ্কল্প ও আত্মপ্রত্যয় লইয়া তরুণ নরেন্দ্রনাথ কলেজে প্রবেশ করিলেন।

সাধক বিবেকানন্দ

জেনারেল এসেম্বলী কলেজে নরেন্দ্রনাথ এফ. এ. পড়িতে লাগিলেন। এই সময় নরেন্দ্রের জ্ঞান-পিপাসা এত বাড়িয়া উঠে যে, তিনি ইতিহাস সাহিত্য ও দর্শন বিষয়ক গ্রন্থরাজির মধ্যে ডুবিয়া থাকিতেন। তাঁহার তীক্ষ্ণবুদ্ধি, ব্যায়ামপুষ্ট বলিষ্ঠ দেহ, সরল মধুর ব্যবহার দেখিয়া অধ্যাপক ও সহপাঠী ছাত্র সকলেই তাঁহাকে ভালবাসিতেন। নরেন্দ্র কাহাকেও খাতির করিয়া কথা বলিতেন না বা কেহ উপস্থিত না থাকিলে তাহার সম্বন্ধে কোন কথা বলিতেন না। কাহারও কোন দোষ দেখিলে মুখের সামনে সেজন্য দু'কথা শুনাইয়া দিতে তিনি চক্ষুলজ্জা বোধ করিতেন না। কেহ কোন অন্যায় কাজ করিলে নরেন্দ্রের ব্যঙ্গ বিদ্রূপে তাহাকে নাকাল হইতে হইত। পুরুষের মেয়েলী ভাবভঙ্গী তিনি দেখিতে পারিতেন না। চাল-চলনে কথাবার্তায় যে সমস্ত ছাত্র মেয়েলী ঢং কি অনাবশ্যক বিলাসদ্রব্য ব্যবহার করিত তাহাদের সমালোচনা করিয়া তিনি অত্যন্ত লজ্জা দিতেন। তবু সকলে তাঁহাকে ভালবাসিত।

কেননা, কাহারও আপদ-বিপদে নরেন্দ্রনাথ স্থির থাকিতে পারিতেন না। আর গানবাজনায় আমোদ প্রমোদেও তিনি ছিলেন সকলের অগ্রণী।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, ছেলেবেলা হইতেই নরেন্দ্রনাথের ধর্ম-পিপাসা ছিল। কাজেই দর্শনশাস্ত্র ও পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান পাঠ করিয়া তাঁহার সেই পিপাসা বাড়িয়া গেল। এই জগতকে কে সৃষ্টি করিয়াছে? আমি কে? ঈশ্বর কি? ঈশ্বরকে কি দেখা যায়? এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর জানিবার জন্য তাঁহার মনে অদম্য আকাঙ্ক্ষা হইত। ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল তখন নরেন্দ্রনাথের সহিত এক কলেজে পড়িতেন। তাঁহার সহিত দর্শন চর্চা করিয়া নরেন্দ্রনাথ মনের অশান্তির কথা খুলিয়া বলিতেন। সত্য কি জানিতে হইবে, এই সংকল্প স্থির করিয়া নরেন্দ্রনাথ ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। সেকালে কলিকাতা সহরে ব্রাহ্মসমাজ খুব জাঁকিয়া উঠিয়াছিল। নরেন্দ্রনাথও কেশববাবুর বক্তৃতা শুনিয়া ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আকৃষ্ট হন। কিন্তু তিনি কেশববাবুর নববিধান সমাজে না গিয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়াছিলেন এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের উপদেশানুসারে ধ্যান করিতেন।

নরেন্দ্রের মন শান্ত হইল না। তিনি চান, এমন

একজন ব্যক্তিকে, যিনি বলিতে পারেন, আমি ঈশ্বর দর্শন করিয়াছি। খৃষ্টান, ব্রাহ্ম ও অন্যান্য ধর্ম-বক্তাদের বক্তৃতা নরেন্দ্র শুনিতে যাইতেন এবং প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করিতেন "মহাশয় কি ঈশ্বর দর্শন করিয়াছেন?" তরুণ যুবকের এ প্রশ্ন শুনিয়া কেহ বা হাসিতেন, কেহ বা স্তোকবাক্যে ভুলাইতে চাহিতেন। কিন্তু নরেন্দ্রনাথের মন অধিকতর চঞ্চল হইল। কেহ ঈশ্বর দেখে নাই; তবে কি ঈশ্বর নাই?—নরেন্দ্রনাথ ক্রমে ঈশ্বর সম্বন্ধে সন্দেহবাদী হইয়া উঠিলেন।

এই সময় একদিন ঘটনাক্রমে দক্ষিণেশ্বরের মহাপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের সহিত নরেন্দ্রের সাক্ষাৎ হয়। সেদিন ঠাকুর রামকৃষ্ণ নরেন্দ্রের এক প্রতিবেশীর বাড়ীতে আসিয়াছিলেন। সেখানে নরেন্দ্রের গান শুনিয়া ঠাকুর খুব খুসী হন এবং একদিন দক্ষিণেশ্বরে যাইতে বলেন। কিন্তু এফ. এ. পরীক্ষার পড়ার চাপে তিনি সেকথা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। এফ. এ. পরীক্ষার পর নরেন্দ্রের আত্মীয়-স্বজন বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। নরেন্দ্র বিষম আপত্তি করিলেন। কাহারও স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা বিশ্বনাথবাবুর প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল, তিনি পুত্রকে পীড়াপীড়ি করিলেন না।

শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম গৃহী-ভক্ত প্রসিদ্ধ ডাক্তার রামচন্দ্র দত্ত মহাশয় নরেন্দ্রের আত্মীয় ছিলেন এবং বাল্যকালে তাঁহাদের বাড়ীতে থাকিয়াই লেখাপড়া করিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত নরেন্দ্রের একদিন বিবাহ সম্বন্ধে কথাবার্তা হইল। নরেন্দ্রের বিবাহে আপত্তির কারণ শুনিয়া তিনি বলিলেন, যদি তুমি প্রকৃতই সত্য লাভ করিতে চাহ, তাহা হইলে ব্রাহ্ম-সমাজ ইত্যাদি নানাস্থানে না ঘুরিয়া দক্ষিণেশ্বরে পরমহংসদেবের নিকট চল। নরেন্দ্রনাথ এই কথায় সম্মত হইলেন এবং একদিন তিনজন বন্ধুর সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইলেন।

নরেন্দ্রকে দেখিয়া ঠাকুর রামকৃষ্ণ এমনভাবে আলাপ করিতে লাগিলেন, যেন কতকালের চেনা। নরেন্দ্র দুই তিনটা গান গাহিয়া ঠাকুরকে শুনাইলেন, তাঁহার গানে ঠাকুরের আনন্দ দেখে কে! তারপর নরেন্দ্রকে ডাকিয়া নির্জন স্থানে লইয়া গেলেন এবং ভাবে বিভোর হইয়া তাঁহার হাত ধরিয়া ঠাকুর বলিতে লাগিলেন, তুই এতদিন কেমন করে আমায় ভুলে ছিলি! তুই আসবি বলে, আমি কতদিন ধরে পথ-পানে চেয়ে আছি। বিষয়ী লোকের সঙ্গে কথা কয়ে কয়ে আমার মুখ পুড়ে গেছে, আজ থেকে তোর মত যথার্থ ত্যাগীর সঙ্গে কথা কয়ে শান্তি পাব—বলিতে

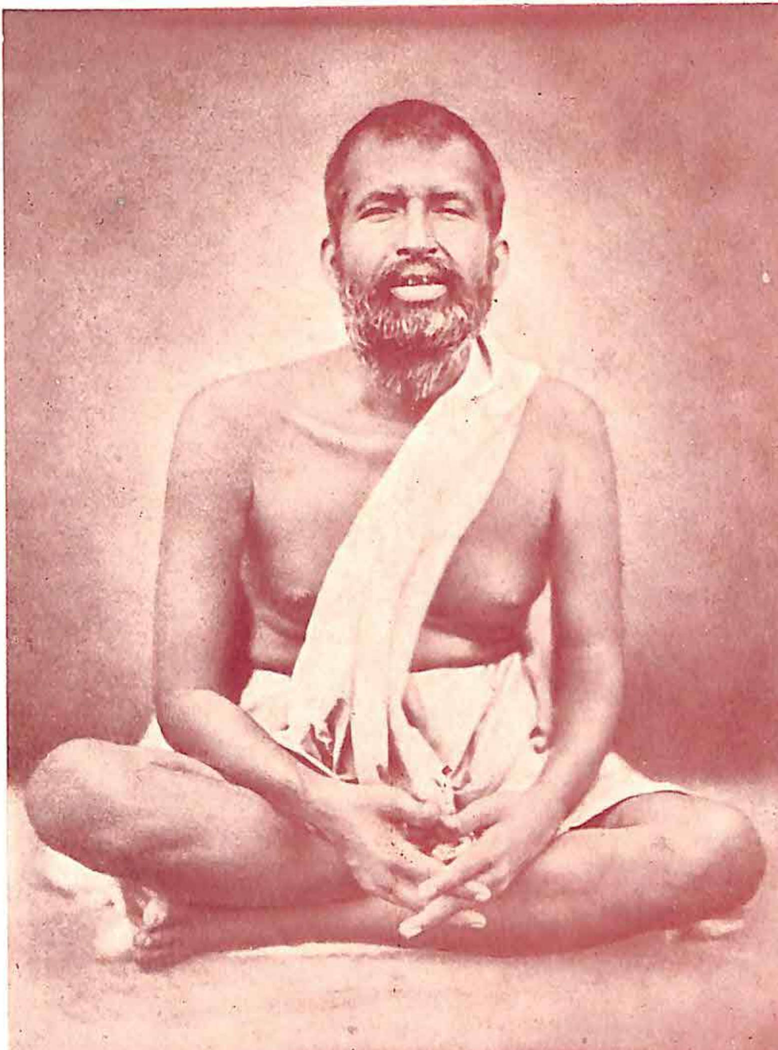
বলিতে পরমহংসের নয়ন হইতে স্নেহাশ্রু ঝরিতে লাগিল। নরেন্দ্র অবাক হইলেন, কোন উত্তর দিলেন না। তারপর ঠাকুর আবার বলিলেন, তুমি সাধারণ মানুষ নও, ভগবান তোমাকে মানব জাতির কল্যাণের জন্য পাঠাইয়াছেন, আমি জানি কে তুমি, কিন্তু তুমি এখনো নিজেকে চিনিতে পার নাই। এসব কথা শুনিয়া নরেন্দ্র আশ্চর্য হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, লোকটা পাগল নাকি? আমি উকীল বিশ্বনাথ দত্তের পুত্র নরেন্দ্র, আমাকে এ সব কি বলিতেছেন। কিন্তু মুখে কিছু বলিলেন না। নীরবে বাড়ীতে চলিয়া আসিলেন।

নরেন্দ্র সব বিষয় স্বাধীনভাবে বিচার করিয়া দেখিতেন। সহজে কোন কথা বিনা প্রমাণে বিশ্বাস করিতেন না। কিন্তু আজ তাঁহার সব গোলমাল হইয়া গেল। দক্ষিণেশ্বরের পরমহংস যে সব কথা বলিলেন, তাহা কি পাগলামি! তাই বা কেমন করিয়া? পাগলই যদি হইবেন, তাহা হইলে কেশবচন্দ্র সেন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বিজয় গোস্বামী প্রভৃতি বড় বড় লোক ইঁহাকে ভক্তি করিবেন কেন? কেন বহু লোক ধর্ম-পিপাসায় ইঁহার নিকট প্রত্যহ যায়? আহা কি সুন্দর সরল মধুর উপদেশ! ইহা কি পাগলে বলিতে পারে? যাহা হউক, নরেন্দ্র যতই

রামকৃষ্ণকে দেখিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার শ্রদ্ধা ভক্তি বাড়িতে লাগিল।

একদিন নরেন্দ্রনাথ দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া ঠাকুরকে প্রশ্ন করিলেন, মহাশয়, আপনি কি ঈশ্বর দর্শন করিয়াছেন? ঠাকুর তৎক্ষণাৎ হাসিয়া উত্তর দিলেন যে, বৎস, আমি ঈশ্বর দর্শন করিয়াছি। তোমাকে চোখের সামনে যেমন স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি, তার চেয়েও স্পষ্টভাবে ঈশ্বরকে দেখিয়াছি। এমন সরলভাবে এত বড় কথা নরেন্দ্র আর কাহারও মুখে শুনেন নাই। নরেন্দ্রের দিকে স্নেহভরে তাকাইয়া ঠাকুর আরও বলিলেন, তোমাকেও দেখাইতে পারি, যদি আমার কথামত তুমি কাজ কর।

যে কাজে একবার হাত দিতেন তাহার শেষ না দেখিয়া ছাড়িতেন না, ইহাই ছিল নরেন্দ্রনাথের স্বভাব। কাজেই লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি গোপনে পরমহংসদেবের উপদেশানুসারে সাধন ভজনে প্রবৃত্ত হইলেন এবং ধর্মশাস্ত্রাদি পাঠ করিতে লাগিলেন। তাঁহার জীবনে এক আমূল পরিবর্তন উপস্থিত হইল। সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া ক্রমে তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব প্রকৃতই একজন সিদ্ধ মহাপুরুষ। ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে বড়



ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

ভালবাসিতেন; সকলের নিকট তাঁহার প্রশংসা করিয়া বলিতেন, নরেন্দ্র নারায়ণ, ওর দেহ মন প্রাণ শুদ্ধ। পড়াশুনার চাপে নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দেখিবার জন্য যদি দক্ষিণেশ্বরে না যাইতে পারিতেন তাহা হইলে ঠাকুর কলিকাতায় গিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিতেন।

এইভাবে কিছুদিন যাইবার পর, নরেন্দ্রনাথের পিতৃবিয়োগ হইল। বিশ্বনাথবাবু বড় দাতা ও মুক্ত-হস্ত ছিলেন। বাবার মৃত্যুর পর বিধবা মা ও ছোট দুইটি ভাইকে নিয়া তিনি বড়ই কষ্টে পড়িলেন। এ সময় তিনি বি.এ. পাশ করিয়াছেন, কাজেই একটা চাকুরীর চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু সময় যখন খারাপ হয়, তখন কোন সুবিধাই হয় না। অনেক চেষ্টা করিয়াও তিনি একটা চাকুরী পাইলেন না। এদিকে মা ও ভাইদের অনাহার দেখিয়া দুঃখে তাঁহার বুক ফাটিয়া যাইত! যদি কোন দিন সামান্য চাউল জুটিত তাহাই কয়েক ভাই ভাগ করিয়া খাইতেন। এই সময়ে তাঁহাদের দুঃখ দেখিয়া অনেক বন্ধুবান্ধব তাঁহাকে সাহায্য করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু নরেন্দ্রনাথ কখনই ভিক্ষা গ্রহণ করেন নাই। নিজেই নানা চেষ্টা করিয়া কিছু রোজগারের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এমন সময় একদিন তাঁহার মনে

হইল, "আচ্ছা ভগবানের উপর নির্ভর করিলে নাকি সংসারে কোন অভাব থাকে না; আমি তো তাঁহার উপর নির্ভর না করিয়া টাকার চেষ্টায় ফিরিতেছি। সত্যই তো ভগবান সংসারের রক্ষাকর্তা। আমি কে?"

নিজের দুঃখের কথা ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার মনে হইল, সংসারে আরও কত গরীব আমার মত দুঃখ পাইতেছে। ভগবান যদি দয়াময় হন, তবে সংসারে এত দুঃখ কেন? এই ভাবিয়া তিনি মনে স্থির করিলেন যে, সন্ন্যাসী হইয়া কঠোর সাধনা করিয়া, তিনি ভগবানের সাক্ষাৎ লাভ করিবেন এবং জিজ্ঞাসা করিবেন, মানুষের এত কষ্ট কেন? একদিন প্রভাতে বিদায় লইবার জন্য পরমহংসদেবের নিকট উপস্থিত হইলেন। ঠাকুর তাঁহার মনের ভাব পূর্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি নরেন্দ্রনাথকে তখন সন্ন্যাসী হইতে নিষেধ করিলেন এবং বলিলেন,—যতদিন আমি জীবিত আছি ততদিন সংসারে থাকিয়া কাজ কর। মা কালীর আশীর্বাদে তোমাদের মোটা ভাত, মোটা কাপড়ের অভাব হইবে না। ঠাকুরের আশীর্বাদে তাহাই হইল।

তখন নরেন্দ্রনাথ বি.এ. পাশ করিয়া আইন পড়িতেছিলেন, পিতার ব্যবসায় বা ওকালতী

করিবার জন্য। একদিন তিনি আইন-পরীক্ষার ফিস্-এর টাকা জমা দিতে গিয়াছেন, এমন সময় তাঁহার ভাবান্তর হইল। মনে মনে ভাবিলেন,—আমি কি মূঢ়, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের মত গুরু পাইয়াও সামান্য সাংসারিক উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতেছি। আমার জীবন কি এত ক্ষুদ্র যে আমি একজন সামান্য উকীল হইয়া সন্তুষ্ট থাকিব? না, ভগবানকে না পাইলে জীবন বৃথা, মনের অশান্তি কিছুতেই দূর হইবে না। এই ভাবিয়া তিনি গুরুর নিকট উপস্থিত হইলেন, আর বাড়ীতে ফিরিয়া গেলেন না। একান্ত মনে সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং ধর্ম-শাস্ত্র পাঠ করিতে লাগিলেন। পরমহংসদেব নরেন্দ্র-নাথকে অন্যান্য শিষ্য অপেক্ষা বেশী স্নেহ করিতেন, নরেন্দ্রনাথও গুরুর প্রতি অতীব ভক্তিপরায়ণ ছিলেন।

তখন নরেন্দ্রনাথের ইচ্ছা ছিল যে সন্ন্যাসী হইয়া বনে জঙ্গলে বা পর্বত-গুহায় ঈশ্বরীয় সাধন-ভজনে জীবন কাটাইবেন। ঠাকুরের কিন্তু ঐভাব ভাল লাগিত না। তিনি বলিতেন, কি নরেন, তুই স্বার্থ-পরের মত নিজের মুক্তি চাস্? এই যে সংসারের শত শত পাপী তাপী দুঃখী মানুষ রয়েছে, এদের ভাল করতে, এদের দুঃখ দূর করতে যদি তোরা না

এগিয়ে যাস্, তাহলে আর কে যাবে? এমনি করিয়া ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে দেশের ও দশের কল্যাণে কাজ করিবার জন্য উৎসাহ দিতেন। পরমহংসদেব বলিতেন, "যত মত, তত পথ", অর্থাৎ সকল ধর্মই সত্য, হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান সকলেই যদি নিজ নিজ পথে থাকিয়া ধর্মাচরণ করে তবে সকলেই ভগবানকে পাইবে। কোন ধর্মই ভুল নয়, সংসারের লোকে না বুঝিয়া ধর্ম লইয়া কত বিবাদ করে। সমস্ত পৃথিবীর লোক যাহাতে এইটি বুঝিয়া পরস্পরকে ভালবাসে, ঘৃণা না করে, এই সত্যটি প্রচার করিবার ভার ঠাকুর নরেন্দ্রের উপর দিলেন। নরেন্দ্র প্রথমে ভাবিলেন,—আমি সামান্য মানুষ, আমি কি লোককে ধর্মশিক্ষা দিতে পারিব? কিন্তু কিছুদিন পরেই তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি ক্ষুদ্র নন, তুচ্ছ নন, এই ভগবানের কাজ তাঁহাকে করিতেই হইবে। ইহা ভাবিয়া খুব কঠোর সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

পরমহংসদেব সকলের চেয়ে নরেন্দ্রনাথকে ভালবাসিতেন এবং প্রশংসা করিতেন বলিয়া সকলেই তাঁহাকে ভালবাসিত ও শ্রদ্ধা করিত। নরেন্দ্রনাথের মত আরও অনেক কলেজের ছেলে ঠাকুরের শিষ্য হইয়াছিলেন। নরেন্দ্র ছিলেন তাঁহাদের দলপতি।

নরেন্দ্রের তেজস্বিতা, চরিত্রবল, পাণ্ডিত্য দেখিয়া সকলেই তাঁহার নিকট মাথা নত করিতেন। তর্কে নরেন্দ্রনাথের সহিত আঁটিয়া উঠিবার উপায় ছিল না। সেই বয়সেই তিনি অনেক বিদ্বান বুদ্ধিমান ব্যক্তিকেও তর্কে হারাইয়া দিতেন। নিজে যেটাকে সত্য বলিয়া বুঝিতেন, মুক্তকণ্ঠে তাহা স্বীকার করিতে নরেন্দ্রনাথ ইতস্ততঃ করিতেন না। তাঁহার তেজস্বিতা, সরলতা ও সুন্দর স্বভাবের জন্য কেহই তাঁহার উপর রাগ করিতেন না। ঠাকুর হাসিয়া বলিতেন, "নরেন যেন খাপ-খোলা তলোয়ার, সকলের কথাই কচ কচ করে কেটে দেয়।"

নরেন্দ্রনাথের আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুগণের মধ্যে অনেকে তাঁহার পরমহংসদেবের নিকট থাকাটা পছন্দ করিতেন না। ইঁহারা দুঃখ করিয়া বলিতেন যে, নরেন্দ্র যদি ওকালতীটা পাশ করিয়া হাইকোর্টের উকীল হইত, তাহা হইলে অনেক টাকা রোজগার করিতে পারিত। যাহাতে নরেন্দ্র ধর্ম-সাধনা ত্যাগ করিয়া সংসারী হন, তাহার জন্য ইঁহারা নানারকম চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু নরেন্দ্রনাথ কিছুতেই বিচলিত হইলেন না। একদিন তাঁহার একজন সহাধ্যায়ী বন্ধু তাঁহাকে সংসারে ফিরিবার জন্য নানাপ্রকার উপদেশ দিতে লাগিলেন। দর্শনশাস্ত্র

আলোচনা, সাধুসঙ্গ, ধর্মালোচনা ইত্যাদি পাগলামী-গুলি ছাড়িয়া দিয়া যাহাতে সাংসারিক সুখ-সুবিধা হয়, তাহার জন্য চেষ্টা করা কর্তব্য, ইহাই তাঁহার বলিবার বিষয় ছিল। নরেন্দ্রনাথ প্রিয়বন্ধুর মুখেও ঐসব কথা শুনিয়া মনে মনে বড় বেদনা পাইলেন। ধীরভাবে উত্তর করিলেন, আমার মনে যে কি ভাব জাগিয়াছে, তাহা তুমি বুঝিতে পারিবে না। গুরুর কৃপায় আমি সত্য বুঝিয়াছি। বিবাহ করিয়া, উকীল হইয়া টাকা রোজগার করিব, এত ছোট কাজের জন্য আমি জন্মগ্রহণ করি নাই। আমি সন্ন্যাসী হইয়া জগতের মঙ্গলের জন্য প্রাণপাত করিব—এই আমার দৃঢ় সংকল্প। কোন সুখের প্রলোভনে আমি সত্য-পথ ছাড়িব না।

নরেন্দ্রের কথা শুনিয়া তাঁহার বন্ধু বলিলেন, দেখ নরেন, তোমার যে প্রকার প্রতিভা ও বুদ্ধি ছিল, তাহাতে তুমি জীবনে অনেক উন্নতি করিতে পারিতে। কিন্তু দক্ষিণেশ্বরের পরমহংস তোমার মাথাটা খাইয়াছেন। যদি ভাল চাও, তাহা হইলে ঐ পাগলের সঙ্গ পরিত্যাগ.কর, নতুবা তোমার সর্বনাশ হইবে।

নরেন্দ্রনাথ বন্ধুর সাবধান-বাণী শুনিয়া মনে মনে হাসিলেন। ভাবিলেন, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের অতুল

মহিমা এই ক্ষুদ্র সংসারী সুখলোভী জীব কেমন করিয়া বুঝিবে? নিজের সুখ তুচ্ছ করিয়া পরের জন্য প্রাণপাত করায় যে কি আনন্দ তাহা স্বার্থপর কেমন করিয়া ধারণা করিতে পারিবে? যদিও বন্ধু কলেজে পড়িয়াছেন, পাশ করিয়াছেন, তবুও তো মানুষ হইতে পারেন নাই। মানুষ হইলে কি আর পরমহংসদেবের মত মানুষকে পাগল বলিত? এই সব মূর্খ পন্ডিতের সঙ্গে তর্ক করা বৃথা বলিয়া নরেন্দ্রনাথ তাহার কথার আর কোন উত্তর দিলেন না।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে পরমহংসদেবের গলায় ঘা হইয়া তিনি শয্যাশায়ী হন। এই সময় নরেন্দ্রনাথ ও আরও কয়েকজন যুবক-শিষ্য মিলিয়া প্রাণপণে গুরুর শুশ্রূষা করিতেন। পরমহংসদেবের ব্যারাম ক্রমেই বেশী হইতে লাগিল, কলিকাতার বড় বড় ডাক্তারেরা চিকিৎসা করিয়া কিছুই করিতে পারিলেন না। এই সময়ে একদিন পরমহংসদেব নরেন্দ্রনাথকে ডাকিয়া বলিলেন, নরেন, তুই কি চাস্?

নরেন্দ্রনাথ উত্তর করিলেন, শুকদেবের মত সব ভুলে কেবল ভগবানের ধ্যানে আপনা ভুলে থাক্‌বো, আর আমি কিছু চাই না।

ঠাকুর বলিলেন, বার বার তোর ঐ কথা বলতে

লজ্জা করে না? কোথায় কালে বট গাছের মত বড় হয়ে শত শত লোককে শান্তিছায়া দিবি, তা না তুই নিজের মুক্তির জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিস, এত ক্ষুদ্র আদর্শ তোর?

নরেন্দ্রনাথের কান্না আসিল, তিনি বলিলেন, ভগবানের উপলব্ধি না হ'লে আমার মন কিছুতেই শান্ত হবে না; আর যদি তা না হয় তা'হলে আমি ওসব কিছুই করবো না।

ঠাকুর শিষ্যের মনের ভাব বুঝিয়া বলিলেন, যা তোর ভগবান দর্শন হবে। কিন্তু এখন তোর মুক্তি নেই। তোকে কাজ করতে হবে। তুই কি ইচ্ছায় করবি? ভগবান তোর ঘাড় ধরে করিয়ে নেবেন। তুই না করিস্, তোর হাড় কর্‌বে।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা ধ্যান করিতে বসিয়া নরেন্দ্রনাথও সে কথাটা বুঝিতে পারিলেন। তাঁহার মনে হইল তিনি সাধারণ সাধু সন্ন্যাসীর মত একাকী গোপন সাধন-ভজন করিবার জন্য জন্মগ্রহণ করেন নাই। তাঁহাকে দেশের গরীব-দুঃখীর উপকার করিতে হইবে। যে মানুষ ভগবানকে চায়, তাহাকে প্রথমে ভগবানের সন্তান মানুষকে ভালবাসিতে হইবে।

এমনি করিয়া গুরু-কৃপায় নরেন্দ্রনাথ পথের

সন্ধান পাইলেন! কেমন করিয়া ভগবানের কাজে আত্মনিয়োগ করা যায় তাহাই ভাবিতে লাগিলেন।

নরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি বারোজন শিক্ষিত, চরিত্রবান ও ধার্মিক যুবক শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সম্মতিক্রমে সন্ন্যাসী হইলেন। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ঠাকুর দেহত্যাগ করিলে ইঁহারা আর বাড়ীতে ফিরিয়া গেলেন না। সকলে মিলিয়া কলিকাতার উত্তরে বরাহনগর গ্রামে একখানা পুরাতন বাড়ী ভাড়া করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। এই বাড়ীতে তরুণ সন্ন্যাসিগণ কঠোর তপস্যা করিতে লাগিলেন। বিবেকানন্দের গুরু-ভ্রাতা স্বামী প্রেমানন্দ এই সময়ের কথা বলিতে গিয়া বলিয়াছিলেন, "আজ যে এই এত বড় মঠ দেখছো, কোথায় এর আরম্ভ! ঠাকুর যখন অপ্রকট হলেন, লাটু আর কয়টি ছেলে কোথায় দাঁড়ায় তার স্থান নেই, শেষে সুরেশ মিত্তির বরাহনগরে একটি বাড়ী ঠিক করে দিলেন। নীচের একতলাটা অব্যবহার্য, উপরের তলায় তিনটে ঘর। ঠাকুরকে কোন দিন দুটো নৈবেদ্য দেওয়া হত। কি আর জুটবে? একবেলা ভাত কোন দিন জুটতো, কোন-দিন জুটতো না। থালা বাসন তো কিছুই নেই, বাড়ীর সংলগ্ন বাগানে লাউগাছ, কলাগাছ ঢের ছিল। দুটো লাউপাতা কি একখানা কলাপাতা কাটতে

গেলে উড়েমালী যা তা গাল দিত। শেষে মানকচুর পাতায় ভাত ঢেলে তাই খেতে হত। তেলাকুচোর পাতা সিদ্ধ আর ভাত, তা আবার মানপাতায় ঢাল্যা। কিছু খেলেই গলা কুটকুট করতো। এত যে কষ্ট, ভ্রূক্ষেপ ছিল না। ভক্তের সংখ্যা দু' একটি করে বাড়তে লাগলো। উৎসাহ কত! পূজা, ধ্যান, জপ সর্বক্ষণ চলছে। হয়তো কীর্তন লেগে গেল। ঘরের দোর বন্ধ করে, ভিতরে জমাট কীর্তন। এমন জমে গেছে যে বাইরে লোক তখনও দাঁড়িয়ে। চীৎকার করে বলছে, "ছাড়বেন না, চমৎকার শুন্‌ছি, ছাড়বেন না।"

এইটুকু হইতেই তোমরা বুঝিতে পারিবে, স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁর গুরুভাইরা এই সময় কত কষ্ট করিয়া সাধন-ভজন করিতেন। এত যে কষ্ট তবু বিবেকানন্দ এ সব কিছু গ্রাহ্য করিতেন না; তিনি তাঁহার গুরুভাইদের বলিতেন,—"জয় রামকৃষ্ণ! মানুষ গড়ে তোলাই আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য হোক। মনে রেখো এই আমাদের একমাত্র সাধনা। বৃথা বিদ্যার গর্ব পরিত্যাগ কর। উৎকৃষ্টতম মতবাদ অথবা কূট তর্ক ইত্যাদির প্রয়োজন কি? ঈশ্বরলাভই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। শ্রীরামকৃষ্ণ স্বীয় জীবনে এ আদর্শ দেখিয়ে গেছেন। আমরা

তাঁর আদর্শ জীবনই অনুকরণ করবো। একমাত্র ভগবান লাভই আমাদের উদ্দেশ্য হোক।"

ইংরাজি লেখাপড়া জানা যুবকদিগকে সন্ন্যাসী হইতে দেখিয়া নানালোকে নানাকথা বলিত। যাঁহারা ইচ্ছা করিলেই অনেক টাকা রোজগার করিতে পারেন, তাঁহারা কেন সন্ন্যাসী হইয়া ভিক্ষা করিয়া খান, সাধারণ লোকে কেমন করিয়া তাহা বুঝিবে? তাই কেহ কোন নিন্দা করিলে সন্ন্যাসীরা মনে বড়ই দুঃখ পাইতেন; বিবেকানন্দ তাঁহাদের সান্ত্বনা দিয়া বলিতেন,—"ওরে ঠাকুর বল্‌তেন, লোক না পোক। তার মানে কি জানিস্? কাম-কাঞ্চনের ক্রীতদাসেরা কি বলছে, তাই শুনে সন্ন্যাসীদের বিচলিত হওয়া সঙ্গত নয়।"

বিবেকানন্দের ভারত-ভ্রমণ

বরাহনগরের ক্ষুদ্র বাড়ীতে ভাবীকালের শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের গোড়াপত্তন হইল। তরুণ সন্ন্যাসীদের নেতা হইলেন স্বামী বিবেকানন্দ। শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া সন্ন্যাসীরা কঠোর তপস্যা করিতে লাগিলেন। সাধনায় সিদ্ধি লাভ না করিলে জনসমাজে রামকৃষ্ণের বাণী প্রচারিত হইবে না। অনেকে প্রসিদ্ধ তীর্থস্থানে অথবা হিমালয়ে গিয়া সাধন-ভজন করিবার জন্য মঠ ত্যাগ করিয়া গেলেন। স্বামিজীও ভাবিতে লাগিলেন, যে ভারতবর্ষের সেবার ভার গুরুদেব দিয়া গিয়াছেন, তাহাকে দেখিতে হইবে, জানিতে হইবে, বুঝিতে হইবে। কেবল শাস্ত্র বা পুঁথি-পুস্তক পড়িয়া একটা জাতির ধর্ম, সভ্যতার সম্যক্ পরিচয় লাভ সম্ভব নহে।

ভারতের সত্য পরিচয় লাভের জন্য স্বামিজী যাত্রা করিলেন, সঙ্গে কোন গুরুভ্রাতাকে লইলেন না। ভিক্ষান্নে উদর পূরণ, দেবালয় লোকালয় কখনও বা বৃক্ষতলে বাস; এমনিভাবে বিহার ও যুক্তপ্রদেশের মধ্য দিয়া তিনি কাশীধামে উপস্থিত

হইলেন। কাশীতে সাক্ষাৎ শিবতুল্য ত্রৈলঙ্গস্বামীর দর্শন লাভ করিয়া তিনি কৃতার্থ হইলেন। কিছুকাল তথায় সাধু সন্ন্যাসী ও পণ্ডিতবর্গের সহিত ধর্ম ও বেদান্তাদি শাস্ত্র আলোচনা করিলেন। কাশী হিন্দুভারতের হৃদ্‌পিণ্ড! ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের লোকের ভাষা আচার ব্যবহার পোষাক পরিচ্ছদে কত পার্থক্য, কিন্তু সুপ্রাচীন জ্ঞান ও সাধনার ক্ষেত্রে এক গভীর ঐক্য রহিয়াছে। এই ঐক্যের মহিমায় বিবেকানন্দের হৃদয় ভরিয়া উঠিল। দণ্ডকমণ্ডলুহস্ত সন্ন্যাসী আবার ভ্রমণ আরম্ভ করিলেন।

রামায়ণের পবিত্র স্মৃতিভরা অযোধ্যায় পুণ্যসলিলা সরযূ নদীতে স্নান করিয়া তিনি ভাবানন্দে বিভোর হইলেন। সেখান হইতে পদব্রজে আগ্রায় উপস্থিত হইয়া ভুবনবিখ্যাত তাজমহল এবং মুঘলসম্রাটগণের প্রাসাদ দুর্গ দর্শন করিলেন। আগ্রা হইতে মথুরা বৃন্দাবন বেশী দূরে নহে। বৃন্দাবনের কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছেন, এমন সময় স্বামিজী দেখিলেন, পথের ধারে একটি লোক বসিয়া তামাক খাইতেছে। ছেলেবেলা হইতেই তিনি ধূমপান করিতেন। পথশ্রমে ক্লান্ত স্বামিজী দু' এক টান তামাক খাইবার জন্য কলিকাটি চাহিলেন। লোকটি

সঙ্কুচিত হইয়া বলিল, মহারাজ, আমি মেথর। জন্মগত সংস্কার! মেথর শুনিবামাত্র নিজের অজ্ঞাত-সারেই স্বামিজী পিছাইয়া গেলেন। পরক্ষণেই তাঁহার মনে হইল, আমি জাতি-কুল-মান বিসর্জন দিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছি। অথচ মেথর শুনিবামাত্র আমার জাতি-অভিমান জাগিয়া উঠিল। অভ্যাসগত সংস্কারের কি প্রভাব! স্বামিজী লজ্জায় মরমে মরিয়া গেলেন, তারপর তিনি ঐ মেথরের পাশে বসিয়া তাহার কলিকা হইতে ধূমপান করিলেন। বৃন্দাবন ও মথুরার দর্শনীয় স্থানগুলি দেখিয়া স্বামিজী আবার পথে বাহির হইলেন।

এই সময় একজন সচ্চরিত্র ও বিদ্বান যুবক তাঁহার শিষ্য হন। ইঁহার নাম শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র গুপ্ত, ইনি যুক্তপ্রদেশের হাতরাস ষ্টেশনের ষ্টেশনমাষ্টার। বিবেকানন্দের সহিত ইঁহার মিলন বড় অদ্ভুত। একদিন সকালবেলায় বিবেকানন্দ রেলষ্টেশনের নিকটে একটি গাছতলায় বসিয়া আছেন, তখন শরৎ-বাবু কাজকর্ম সারিয়া বাসায় ফিরিতেছিলেন। তিনি দেখিলেন, এক অপরূপ-সুন্দর তরুণ-সন্ন্যাসী গাছতলায় বসিয়া আছেন। দেখিবামাত্র তাঁহার হৃদয়ে ভক্তি ও শ্রদ্ধার উদয় হইল। তিনি বলিলেন, আপনি দেখিতেছি সন্ন্যাসী, এখানে নূতন

আসিয়াছেন। আপনি ক্ষুধিত ও পরিশ্রান্ত। দয়া করিয়া আমার বাসায় চলুন, সেইখানেই বিশ্রাম করিবেন। স্বামিজী সম্মত হইয়া তাঁহার বাসায় উপস্থিত হইলেন। স্বামিজী আহারান্তে বিশ্রাম করিয়া সুস্থ হইলে শরৎবাবু তাঁহাকে বলিলেন, অনেকদিন হইতে আমার ঈশ্বর-সাধনা করিবার ইচ্ছা, কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষক খুঁজিয়া পাইতেছি না। আপনি যখন দয়া করিয়া দর্শন দিয়াছেন তখন আমাকে ধর্মশিক্ষা দিন। স্বামিজী হাসিয়া বলিলেন, এ বড় কঠোর সাধনা, তুমি পারিবে কি?

শরৎবাবু তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, স্বামিজী, আমি আপনার আজ্ঞাবহ ভৃত্য। যাহা আদেশ করিবেন, আমি তাহাই পালন করিব।

স্বামিজী বলিলেন, শোনো বৎস! এ দেশের কী শোচনীয় দুরবস্থা! আজকালকার লোকের ধর্মের উপর বিশ্বাস নাই। হিন্দুধর্মের পুনরুদ্ধার করিবার জন্য আমার গুরু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আমার উপর ভার দিয়া গিয়াছেন, সমগ্র জগতে ধর্মপ্রচার করিতে হইবে। কিন্তু আমি একা, এত বড় কাজ কেমন করিয়া করিব?

শরৎবাবু বিনীতভাবে বলিলেন, আমি কি আপনার কোন কাজে লাগিতে পারি না?

স্বামিজী বলিলেন, তুমি কি এই মহৎ কার্যের জন্য ভিক্ষাপাত্র ও কমণ্ডলু সম্বল করিয়া পথে দাঁড়াইতে প্রস্তুত আছ? তুমি সন্ন্যাসী হইয়া এত কষ্ট সহ্য করিতে পারিবে?

শরৎবাবু বলিলেন, আপনার কৃপা হইলে নিশ্চয়ই সহ্য করিতে পারিব।

এইবার স্বামিজী শিষ্যকে পরীক্ষা করিবার জন্য বলিলেন, আচ্ছা বেশ, দেখি তুমি সন্ন্যাসী হইতে পারিবে কি না। এই আমার ভিক্ষার ঝুলি লও, তোমার ষ্টেশনের কুলীদের নিকট হইতে ভিক্ষা করিয়া আইস।

শরৎবাবু তৎক্ষণাৎ ভিক্ষার ঝুলিটা কাঁধে ফেলিয়া ভিক্ষা করিতে গেলেন। কিছুকাল পর ভিক্ষা করিয়া ফিরিয়া আসিলে স্বামিজী তাঁহাকে আশীর্বাদ করিলেন। অবশেষে শরৎবাবু তাঁহার পিতামাতার সম্মতি লইয়া স্বামিজীর শিষ্য হইলেন এবং সন্ন্যাসী হইলেন। বিবেকানন্দ তাঁহার নাম রাখিলেন, স্বামী সদানন্দ।

কিছুদিন পর স্বামিজী বিদায় লইতে উদ্যত হইলে, সদানন্দও তাঁহার সঙ্গী হইবার জন্য অনুনয় করিতে লাগিলেন। শিষ্যের আগ্রহ দেখিয়া স্বামিজী তাঁহাকে লইয়া হৃষিকেশ আসিলেন। হরিদ্বার

হইতে পাঁচ মাইল উত্তরে ঋষিকেশ পুণ্যতীর্থ। এইখানেই পুণ্যসলিলা গঙ্গানদী হিমালয় হইতে সমতলক্ষেত্রে নামিয়া আসিয়াছেন। এখানে গঙ্গার দুই তীরে সাধু সন্ন্যাসীরা কুটীরে বাস করিয়া ধ্যান তপস্যা করেন; বেদ বেদান্ত আলোচনা করেন। সদ্য সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী সদানন্দ তাঁহার দেবমানব গুরুর নির্দেশে তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। কিছু-কাল পর বিবেকানন্দ বরাহনগর মঠে ফিরিয়া আসিলেন।

১৮৮৮ সালের নবেম্বর মাস। শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী ও গৃহী ভক্তরা প্রিয়তম "নরেন্দ্র"কে বহু-দিন পর ফিরিয়া পাইয়া আনন্দিত হইলেন। ইতিহাস দর্শন ধর্মতত্ত্ব দুইবেলা আলোচিত হইতে লাগিল। বিবেকানন্দ তাঁহার গুরুভাইদের বলিতে লাগিলেন, কেবল ধর্মপ্রচার নহে, সাধারণ মানুষের উন্নতি ব্যতীত ধর্ম অর্থহীন। যে দেশে অধিকাংশ মানুষ দরিদ্র, ছোটজাত বলিয়া উপেক্ষিত, সে দেশের কল্যাণ নাই। হাজার বৎসরের জমাট কুসংস্কার দূর করিয়া চণ্ডাল, মুচি, মেথর, মুর্দাফরাস এদের মানুষ করিয়া তুলিতে হইবে। আমরা ধ্যান জপ করিয়া নিজের মুক্তির জন্য সন্ন্যাসী হই নাই—জ্ঞান দিয়া বিদ্যা দিয়া দীন দরিদ্র ও

পতিতের সেবাই আমাদের প্রধান কাজ।

দেড়মাস পর স্বামিজী গাজীপুর যাত্রা করিলেন। এখানে প্রসিদ্ধ জ্ঞানযোগী পওহারী বাবার দর্শনলাভই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। পওহারী বাবা লোকজনের সঙ্গে মিশিতেন না, গঙ্গাতীরে একটি গুহার মধ্যে থাকিয়া তপস্যা করিতেন। ইঁহার সহিত সাধন-ভজন সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া স্বামিজীর মনে তীব্র বৈরাগ্য ও তপস্যা করিবার ইচ্ছা বলবতী হইল। তিনি পুনরায় ঋষিকেশে আসিলেন। তাঁহার কয়েকজন গুরুভ্রাতাও এখানে ছিলেন। তিনি সাময়িকভাবে দেশ ও দশের কাজের কথা ভুলিয়া গেলেন; নির্বিকল্প সমাধি লাভের জন্য তপস্যা করিতে লাগিলেন। কিন্তু বার বার অকৃতকার্য হইয়া বুঝিলেন, অন্যান্য সাধু সন্ন্যাসীর মত নির্জনে ধ্যান ও সাধনার জন্য তাঁহার জন্ম হয় নাই। তাঁহাকে বহু কাজ করিতে হইবে, তাহার পূর্বে মুক্তি নাই।

হিমালয় ছাড়িয়া স্বামিজী পাঞ্জাবের বিভিন্ন অঞ্চল ভ্রমণ করিয়া রাজপুতানায় প্রবেশ করিলেন। রাজপুতানার অন্যতম দেশীয় রাজ্যের রাজধানীতে আসিয়া স্বামিজী স্থানীয় এক বাঙ্গালী ডাক্তারের অতিথি হইলেন। ইংরাজী ও সংস্কৃত ভাষায়

সুপণ্ডিত সন্ন্যাসীর নাম সহরময় ছড়াইয়া পড়িল। প্রত্যহ বহুলোক তাঁহার নিকট আসিতে লাগিল। একদিন আলোয়ার রাজ্যের দেওয়ানজী স্বামিজীর সহিত আলাপ করিয়া খুব সুখী হইলেন এবং তাঁহাকে নিজের বাড়ীতে লইয়া আসিলেন। আলোয়ারের মহারাজ বাহাদুর সাহেবদের সঙ্গে মিশিয়া সাহেবী চালচলন নকল করিতেন। হিন্দু-ধর্মের প্রতি তাঁহার বিশ্বাস ছিল না। তিনি নিজের আত্মীয়-স্বজন ও দেশী লোকের সঙ্গে না মিশিয়া সর্বদা সাহেবদের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া, শিকার, আমোদ-আহ্লাদ করিতেন। ইহার জন্য রাজ্যের প্রজারা মনে বড়ই কষ্ট পাইত। স্বামিজীর উপদেশে মহারাজের মতিগতি ফিরিতে পারে মনে করিয়া দেওয়ান বাহাদুর মহারাজকে একখানি পত্র লিখিলেন, "এখানে একজন মহাপণ্ডিত সন্ন্যাসী আসিয়াছেন, ইংরাজী ভাষায় তাঁহার অদ্ভুত অধিকার দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি। মহারাজ বাহাদুর ইঁহার সহিত আলাপ করিলে সন্তুষ্ট হইবেন, সন্দেহ নাই।" মহারাজ তখন শিকার করিবার জন্য রাজধানীর বাহিরে ছিলেন। ঘটনাক্রমে পর দিনই তিনি রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন। দেওয়ান সাহেবের বাড়ীতেই স্বামিজীর সহিত মহারাজের

দেখা হইল। মহারাজ স্বামিজীর সহিত আলাপ করিয়া সুখী হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, স্বামিজী মহারাজ! আমি শুনিয়াছি, আপনি একজন বিদ্বান্ ও মহাপণ্ডিত ব্যক্তি। আপনি ইচ্ছা করিলেই অনেক টাকা পয়সা উপার্জন করিতে পারেন, তবু আপনি ভিক্ষা করিয়া খান কেন?

স্বামিজী বলিলেন, মহারাজ! আগে আমার প্রশ্নের উত্তর দিন। আপনি কেন রাজকার্য অবহেলা করিয়া সাহেবদের সঙ্গে শিকার করা ইত্যাদি বৃথা আমোদ-প্রমোদে কালক্ষেপ করেন? মহারাজ একটু ভাবিয়া বলিলেন, হাঁ, আমি আমোদ-প্রমোদ বেশী করি, কেননা আমার বেশ ভাল লাগে। স্বামিজীও তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, আমারও ভাল লাগে তাই সন্ন্যাসী হইয়াছি এবং ভিক্ষা করিয়া খাই।

এই রকম আলাপে মহারাজ এবং অন্যান্য রাজকর্মচারিগণ সকলেই বুঝিলেন যে, বিবেকানন্দ কেবল সুপণ্ডিত নহেন, নির্ভীক ও স্পষ্টবাদী। যাহা হউক, তারপর মহারাজ বাহাদুর স্বামিজীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, আচ্ছা স্বামিজী! আমি তো হিন্দুর ঠাকুর দেবতা মানি না। মাটি, পাথর বা ধাতুর নির্মিত দেবদেবীর মূর্তিগুলির প্রতি আমার

ভক্তি নাই, এর জন্য কি পরকালে আমার শাস্তি হইবে?

স্বামিজী বুঝিলেন যে, মহারাজ সাহেবদের সঙ্গে মিশিয়া হিন্দু-ধর্মের প্রতি বিশ্বাস হারাইয়াছেন। অসাধারণ বুদ্ধিমান স্বামিজী একটা দৃষ্টান্ত দিয়া মহারাজকে বুঝাইয়া দিবার জন্য তাঁহার সম্মুখে মহারাজার যে একখানা ফটোগ্রাফ ঝুলান ছিল, সেখানা আনিবার জন্য বলিলেন। দেওয়ানজী ফটোগ্রাফখানা স্বামিজীর হাতে দিলে স্বামিজী উহা মাটিতে রাখিয়া যে সমস্ত লোক সেখানে উপস্থিত ছিলেন, সকলকে ডাকিয়া বলিলেন, "আপনারা এই ছবিখানার উপর থুতু ফেলুন।" মহারাজের সম্মুখে তাঁহার ছবির উপর থুতু ফেলিতে কেহই সাহস পাইলেন না। স্বামিজী দেওয়ান বাহাদুরকে বলিলেন, "আপনি তো দেখিতেছেন, এই ছবিখানা কাগজ মাত্র, ইহার মধ্যে তো আর মহারাজ নাই, তবু আপনি থুতু ফেলিতে ভয় পাইতেছেন কেন?"

দেওয়ান বাহাদুর বলিলেন, "বলেন কি স্বামিজী, মহারাজের ছবির মধ্যে থুতু ফেলিয়া আমরা কি তাঁহার অপমান করিতে পারি?"

স্বামিজী বলিলেন, "বেশ কথা! দেখিলেন

মহারাজ, যদিও ছবিখানার মধ্যে আপনার কিছুই নাই, তবুও এঁরা কেমন শ্রদ্ধা করিতেছেন। হিন্দুরা দেবদেবীর মূর্তিগুলিকে এই ভাবেই শ্রদ্ধা করেন। তাঁহারা তো আর মাটি, পাথর, কাঠের পূজা করেন না, মূর্তির মধ্য দিয়া ভগবানকেই পূজা করেন। আমি সন্ন্যাসী হওয়ার পর অনেক স্থান ভ্রমণ করিয়াছি; এ পর্যন্ত কোন হিন্দুকে বলিতে শুনি নাই, "হে মাটি, হে পাথর, আমি তোমাকে পূজা করিতেছি।" অতএব মহারাজ যদি ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখেন, তাহা হইলে দেখিবেন, ভক্তরা ভগবানেরই পূজা করেন, পুতুলের পূজা করেন না।"

স্বামিজীর কথায় মহারাজের চৈতন্য হইল। তিনি স্বামিজীকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, এতদিনে আমি মূর্তিপূজার প্রকৃত রহস্য বুঝিলাম। আপনি আমার জ্ঞানচক্ষু খুলিয়া দিলেন। স্বামিজী আলোয়ার রাজ্যে কিছুদিন বাস করিলেন। কয়েকজন ধার্মিক যুবক তাঁহার শিষ্য হইলেন।

আলোয়ার হইতে স্বামিজী জয়পুরে আসিলেন। এখানেও বিবেকানন্দের পরিচয় গোপন রহিল না, জয়পুর রাজ্যের প্রধান সেনাপতি তাঁহাকে নিজ বাটীতে লইয়া আসিলেন। রাজসভায় তখন এক-

জন ব্যাকরণবিদ্ পণ্ডিত ছিলেন। পাণিনি অষ্টাধ্যায়ী—সংস্কৃত ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাকরণ। বিবেকানন্দ উহা পূর্বেই পাঠ করিয়াছিলেন। এখানে উক্ত পণ্ডিত মহাশয়ের সাহায্যে তিনি কয়েকটি দুর্বোধ্য সূত্রের অর্থ আয়ত্ত করিলেন। পণ্ডিতজী স্বামিজীর সংস্কৃত ভাষায় প্রগাঢ় অনুরাগ দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, আপনি যোগী, নতুবা এত অল্প বয়সে এমন পাণ্ডিত্য সম্ভব হয় না।

জয়পুর হইতে স্বামিজী হিন্দু-মুসলমানের পবিত্র তীর্থ আজমীঢ় হইয়া মনোহর আবু পর্বতে আসিলেন। নগরের রাজপথে সৌম্যদর্শন সন্ন্যাসী বসিয়া আছেন, এমন সময় কোটা দরবারের উকীলের দৃষ্টি তাঁহার উপর পড়িল। এই ভদ্রলোক মুসলমান এবং উকীল হইলেও বিভিন্ন ধর্মমত সম্বন্ধে তাঁহার আগ্রহ ছিল। কিছুক্ষণ আলাপের পরই তিনি স্বামিজীকে আদর করিয়া নিজের বাড়ীতে লইয়া আসিলেন এবং কোটার প্রধান মন্ত্রী ঠাকুর ফতে সিং প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির সহিত আলাপ করাইয়া দিলেন। এই সময় মৌলবী সাহেবের আহ্বানে খেতরীর রাজা বাহাদুরের সেক্রেটারী মুন্সী জগমোহন লাল একদিন ইংরাজী-জানা সাধু দর্শন

করিতে আসিলেন। ইংরাজী স্কুলের ছাত্র গ্রাজুয়েট জগমোহন লালের সাধু সন্ন্যাসীর প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল না। কৌপীনধারী বিবেকানন্দ তখন একখানি খাটিয়ায় শুইয়া ছিলেন। জগমোহন মনে করিলেন, অতি সাধারণ ভবঘুরে ভেকধারী সাধু, চোর জুয়াচোরও হইতে পারে।

এমন সময় স্বামিজী উঠিয়া বসিলেন। উভয়ের আলাপ আরম্ভ হইল। কথায় কথায় মুন্সিজী বলিলেন, "আপনি হিন্দু সন্ন্যাসী হইয়া মুসলমানের বাড়ীতে আছেন; মুসলমানের ছোঁয়া খাদ্য পানীয় হয়তো আপনি গ্রহণ করেন; ইহাতে তো আপনার ধর্মহানি হইতে পারে।" স্বামিজী হাসিয়া বলিলেন, "মহাশয়, আপনার একথা বলিবার অর্থ কি? আমি সন্ন্যাসী, গৃহস্থের সামাজিক আচার নিয়ম আমার জন্য নহে। আমি যে কোন জাতির যে কোন ধর্মের লোকের হাত হইতে খাদ্য গ্রহণ করিতে পারি। ধর্মশাস্ত্রের বিধানকেও আমি ভয় করি না। কিন্তু আমার ভয় আপনাদের মত সবজান্তা ইংরাজীনবীশদিগকে। আপনারা হিন্দুর প্রকৃত ধর্মশাস্ত্রের কথা কিছুই জানেন না, সাধারণ লোকের আচার নিয়ম দেখিয়া নাক সিটকান। আমি সকলের মধ্যেই এক ব্রহ্মকে দেখি। আমার নিকট

ছোট-বড় বা অস্পৃশ্য বলিয়া কিছু নাই। শিব শিব!"

সন্ন্যাসী তরুণ হইলেও জ্ঞানে প্রবীণ। ইউ-রোপের সমাজতত্ত্ব, বিজ্ঞান, ইতিহাস আলোচনা করিয়া জগমোহন মুগ্ধ হইলেন। জগমোহনের নিকট বৃত্তান্ত শুনিয়া খেতরীর রাজা মঙ্গল সিংহ স্বামিজীর সহিত দর্শনের জন্য ব্যাকুল হইলেন। জগমোহনের সহিত স্বামিজী রাজভবনে আসিলেন। অভ্যর্থনা ও আপ্যায়নের পর রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "স্বামিজী, জীবনটা কি?"

রাজার মুখের দিকে চাহিয়া স্বামিজী বলিলেন, "মানুষের মধ্যে এমন একটা শক্তি আছে, যাহা নিজেকে পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ করিবার জন্য সতত চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু বাহিরের প্রতিকূল ও বিরুদ্ধ শক্তিগুলি তাহাকে দাবাইয়া রাখিতেছে। চারিদিকের বন্ধনের বাধা অতিক্রম করিবার চেষ্টা বা সংগ্রামের নামই জীবন।" কয়েকদিনের মধ্যেই রাজাবাহাদুর ও মুন্সী জগমোহন স্বামিজীর শিষ্য হইলেন, এবং তাঁহাকে খেতরীতে লইয়া গেলেন। রাজশিষ্যের গৃহে কিছুদিন থাকিয়া স্বামিজী বিদায় চাহিলেন, রাজা মঙ্গল সিংহ দুঃখের সহিত বলিলেন, গুরুদেব, আমার পুত্রসন্তান নাই বলিয়া

বড় দুঃখ পাই, আপনি আশীর্বাদ করুন। রাজার আবেদনে স্বামিজী বিচলিত হইয়া বলিলেন, শ্রীশ্রীঠাকুরের দয়া হইলে আপনার মনের ইচ্ছা পূর্ণ হইবে।

রাজপুতানার মরুভূমি পার হইয়া স্বামিজী গুজরাট অতিক্রম করিলেন। আহমদাবাদ, লিম্বডি, ভোজ, ভেরাওল, জুনাগড়, প্রভাস ও সোমনাথের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দর্শন করিয়া তিনি পশ্চিম সমুদ্রতীরে পোরবন্দরে আসিলেন। লিম্বডির মহারাজা ইতিপূর্বেই স্বামিজীর শিষ্য হইয়াছিলেন; তিনি স্বামিজীকে রাজপথে ভিক্ষা করিতে দেখিয়া মনে বড় কষ্ট পাইলেন এবং তাঁহাকে স্বীয় প্রাসাদে লইয়া আসিলেন। তখন পোরবন্দরে শঙ্কর পান্ডুরঙ্গ নামে একজন বিখ্যাত বেদান্তের পন্ডিত ছিলেন। তাঁহার সহিত স্বামিজী বেদান্ত আলোচনা করিতে লাগিলেন এবং অল্প কয়েক-দিনের মধ্যেই পান্ডুরঙ্গ মহাশয়ের পান্ডিত্য দেখিয়া তাঁহাকে আচার্য বলিয়া সম্বোধন করিতে লাগিলেন। এই সময় ঘটনাক্রমে গোবর্ধন মঠের শঙ্করাচার্য পোরবন্দরে আসিলেন। তাঁহার সভাপতিত্বে এক বিচারসভা বসিল। বয়োবৃদ্ধ পন্ডিতগণ স্বামিজীকে ব্রহ্মবিদ্যা বিষয়ক প্রশ্ন করিতে লাগিলেন; তিনি

নম্রভাবে সুললিত সংস্কৃত ভাষায় উত্তর দিতে লাগিলেন। স্বামিজীর মীমাংসা ও বিচার প্রণালী দেখিয়া বয়োবৃদ্ধ পণ্ডিতমণ্ডলী স্বামিজীকে সাধু সাধু বলিয়া আশীর্বাদ করিলেন।

স্বামিজীর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইবার পর একদিন কথায় কথায় অধ্যাপক পাণ্ডুরঙ্গ বলিলেন, "স্বামিজী, এ দেশে ধর্ম প্রচার করিয়া আপনি বিশেষ সুবিধা করিতে পারিবেন না। আপনার উদার ভাবগুলি দেশের লোক অনেক বিলম্বে বুঝিবে। বৃথা শক্তিক্ষয় না করিয়া আপনি পাশ্চাত্ত্য দেশে গমন করুন। সেখানে লোক মহত্ত্বের ও প্রতিভার সম্মান করিতে জানে। আপনি নিশ্চয়ই পাশ্চাত্ত্যের যুক্তিপন্থী শিক্ষিত ব্যক্তিদের আমাদের প্রাচীন জ্ঞানরাশির প্রতি অনুরাগী করিতে সক্ষম হইবেন। বিদেশে বেদান্ত প্রচার আপনার দ্বারাই সম্ভব হইবে বলিয়া মনে করি।"

স্বামিজী উত্তর দিলেন, "একদিন প্রভাসে সমুদ্রতীরে দাঁড়াইয়া আমার মনে হইয়াছিল, এই সিন্ধু পার হইয়া আমাকে কোন সুদূর দেশে যাইতে হইবে, কিন্তু তাহা কবে কি ভাবে সফল হইবে বুঝিতে পারিতেছি না।"

এই কালে ভারতের বাহিরে যাওয়ার কথা

স্বামিজী চিন্তা করিতেন না। জনসাধারণের উন্নতি ও শিক্ষা বিস্তার সম্পর্কে তিনি ভাবিতেন যে, রাজা মহারাজা ও ধনীদের বুঝাইয়া সহজেই ইহা করিতে পারা যাইবে। এই জন্যই ভারত-ভ্রমণ কালে তিনি ইচ্ছা করিয়াই রাজা মহারাজাদের অতিথি হইতেন এবং দেশসেবার জন্য তাঁহাদের উপদেশ দিতেন। তাঁহার আশা ছিল জনসাধারণের অজ্ঞতা ও দারিদ্র্যের প্রতিকার করিতে রাজা মহারাজারা অগ্রসর হইলে কাজ অনেক সহজ হইবে। ভ্রমণ করিতে করিতে দেশবাসীর দুঃখ দুর্দশা তিনি যত দেখিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার প্রাণ কাঁদিতে লাগিল।

গুজরাট, কাথিওয়াড় হইতে বোম্বাই হইয়া স্বামিজী ট্রেণে পুনায় চলিয়াছেন, ঐ কামরায় তিনজন শিক্ষিত মারাঠী যুবক নানা বিষয়ে তর্ক করিতেছিলেন। সম্ভবতঃ স্বামিজীর গেরুয়া দেখিয়া তর্ক ক্রমে সন্ন্যাস লইয়া আরম্ভ হইল। দুইজন যুবক সন্ন্যাসীদের নানারূপ দোষ দেখাইতেছিলেন, আর একজন যুবক তাহাদের মত খণ্ডন করিয়া ভারতের শিক্ষা সংস্কৃতিতে সন্ন্যাসীদের দানের দৃষ্টান্ত দিতেছিলেন। এই শেষোক্ত যুবক ভারতের জাতীয় দলের নেতা লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক। ইঁহারা ইংরাজীতে তর্ক করিতে-

ছিলেন, গেরুয়া-পরা সন্ন্যাসী যে কিছু বুঝিতেছেন এরূপ ধারণাও তাঁহাদের ছিল না। ক্রমে তিলকের পক্ষ লইয়া স্বামিজী যখন তর্কে যোগ দিলেন, তখন তাঁহাদের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। স্বামিজীর পাণ্ডিত্য ও বাগ্মিতা দর্শনে লোকমান্য তিলক মুগ্ধ হইলেন এবং স্বামিজীকে স্বালয়ে লইয়া গেলেন। তিলক মহারাজ বৈদিক সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন, স্বামিজী তাঁহার সঙ্গে আলোচনা করিয়া তৃপ্ত হইলেন।

মহারাষ্ট্রের মধ্য দিয়া ভ্রমণ করিতে করিতে স্বামিজী মহীশূর রাজ্যে আসিলেন। মহীশূরের দেওয়ানজী ও মহারাজা বাহাদুর স্বামিজীকে আদর করিয়া রাজবাড়ীতে রাখিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের প্রখর প্রতিভা, পবিত্র চরিত্র এবং সরল বালকের ন্যায় স্বভাব দেখিয়া মহারাজা মুগ্ধ হইলেন। সত্য কথা বলিতে স্বামিজী কখনো সঙ্কোচ বোধ করিতেন না, এমন কি মহারাজার কোন কার্যের ত্রুটি দেখিলে তৎক্ষণাৎ তীব্র সমালোচনা করিতেন, মহারাজা ইহাতে বড়ই আনন্দিত হইতেন। একদিন এই রকম একটা কথায় স্বামিজীকে পরীক্ষা করিবার জন্য মহারাজা কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া কহিলেন, "স্বামিজী, আমি

এত বড় একজন মহারাজা, আমাকে আপনার ভয় করা উচিত, খোসামোদ করা উচিত। আমার কাজের ভুল ধরা আপনার উচিত নহে। ভবিষ্যতের জন্য আপনি সাবধান হইবেন, নতুবা আপনার জীবন সংকটাপন্ন হইতে পারে।"

মহারাজা যে ঠাট্টা করিতেছেন ইহা স্বামিজী বুঝিলেন না। তিনি তৎক্ষণাৎ তেজের সহিত উত্তর দিলেন, "মহারাজ, আপনার অসংগত কথা ও কাজে সায় দিবার জন্য বহু পারিষদ ও মোসাহেব আছেন। আমি সন্ন্যাসী, সত্যই আমার তপস্যা। সামান্য জড়দেহের অনিষ্টাশংকায় সত্যকে পরিত্যাগ করিব! আপনি হিন্দু রাজা হইয়া একজন হিন্দু সন্ন্যাসীর নিকট কি এইরূপ হীন আচরণ প্রত্যাশা করেন?"

নির্ভীক বিবেকানন্দের মুখে স্পষ্ট উত্তর পাইয়া মহারাজা আনন্দিত হইলেন।

মহীশূরাধিপের উদার ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া স্বামিজী অনেক দিন মহীশূরে ছিলেন। বিদায়ের সময় মহারাজা স্বামিজীকে বলিলেন, "আপনি আমার নিকট কিছুই গ্রহণ করিলেন না। আপনার কোন কাজের জন্য কিছু টাকা দিতে পারিলে আমি খুব খুসী হইতাম।" সুযোগ বুঝিয়া স্বামিজী উত্তর দিলেন, "মহারাজ, আমি ফকীর সন্ন্যাসী,

টাকায় আমার দরকার কি? আমাকে খুসী করাই যদি আপনার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে রাজ্যের গরীব প্রজাদের শিক্ষার ব্যবস্থা এবং সাংসারিক উন্নতির ব্যবস্থা করিতে যদি আপনার ন্যায় মহারাজা অগ্রসর হন, তাহা হইলে দেশের কত কল্যাণ হয়! এত রাজা মহারাজার দ্বারে দ্বারে যে আমি ঘুরিতেছি, ইহার উদ্দেশ্য নিজের স্বার্থসিদ্ধি নয়, দেশের গরীবদের বর্তমান অবস্থা পরিবর্তনের যদি কোন উপায় হয় তাহাই।"

মহারাজা স্বামিজীর অনুরোধে নিজরাজ্যে গরীব প্রজাদের লেখাপড়া শিখিবার বন্দোবস্ত করিবেন বলিয়া স্বীকার করিলেন। স্বামিজী আনন্দিত মনে মহারাজার নিকট বিদায় লইয়া সেতু-বন্ধ রামেশ্বরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। বিদায়ের সময় মহারাজা স্বামিজীকে অনেক বহুমূল্য দ্রব্য এবং স্বর্ণমুদ্রাপূর্ণ আধার উপহার দিয়াছিলেন। স্বামিজী সে সকল কিছু না লইয়া স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ একটি ছোট চন্দনকাষ্ঠের হুকা গ্রহণ করিলেন মাত্র। মহারাজা স্বামিজীর ত্যাগ দেখিয়া শ্রদ্ধাভরে কহিলেন, "আপনার ধর্মপ্রচার কার্যে ভবিষ্যতে সাহায্যের প্রয়োজন হইলে আমার নিকট গ্রহণ করিবেন।"

মহীশূর হইতে বিদায় লইয়া স্বামিজী কোচিন ও ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের মধ্য দিয়া মাদুরায় আসিলেন। নায়ার রাজবংশের শ্রীমীনাক্ষী দেবীর বিশাল মন্দির দেখিয়া স্বামিজী বিস্মিত হইলেন। এইখানে রামনাদের রাজা ভাস্কর বর্মা সেতুপতি স্বামিজীর শিষ্য হন। তিনি দেখিলেন, তাঁহার গুরু ধর্মের কথা খুবই কম বলেন। শিক্ষা বিস্তার, জনসাধারণের আর্থিক উন্নতির জন্য বৈজ্ঞানিক কৃষি ও শিল্পের প্রবর্তনের জন্যই আলাপ আলোচনায় অধিক আগ্রহ দেখাইয়া থাকেন। এরূপ নূতন ভাবের ভাবুক সন্ন্যাসী, ভারতে এই প্রথম।

দক্ষিণ ভারতের কাশী—সেতুবন্ধ রামেশ্বর। এখানে ভুবনবিখ্যাত শিবমন্দিরে বিগ্রহাদি দর্শন করিয়া স্বামিজী কন্যাকুমারী অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। ১৮৮৮ সালের শেষভাগে অশান্ত তরুণ সন্ন্যাসী বরাহনগর মঠ হইতে ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন, ১৮৯২ সালের ডিসেম্বর মাসে তাহার শেষ হইল। ভারতের জাতীয় সমস্যাগুলির সহিত প্রত্যক্ষ পরিচয় বিবেকানন্দের চিন্তাধারায় বহু পরিবর্তন আনিল।

দক্ষিণ সমুদ্রতীরে কন্যাকুমারী বা হৈমবতী উমার মন্দির। মন্দিরের প্রস্তর-সোপান-শ্রেণীর

উপর ভারত মহাসাগরের তরঙ্গমালা ভাঙিগয়া পড়িতেছে। এই মন্দিরের পাদদেশে ভারতবর্ষের সর্বশেষ প্রস্তরখানির উপর বিবেকানন্দ বসিলেন। তাঁহার সম্মুখে সুনীল জলধি রবিকরে হাসিতেছে, পশ্চাতে কত মরু গিরি অরণ্য জনপদ লইয়া বিশাল ভারতবর্ষ। এই ভারতবর্ষ তিনি দেখিয়াছেন। নৃপতি ও বণিক, পণ্ডিত ও মূর্খ, ধনী ও কৃষক সকলের সহিত মিশিয়াছেন। আজ তাঁহার ভ্রমণ শেষ। যে উদ্দেশ্য লইয়া তিনি হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্যন্ত বিশাল ভারতবর্ষ পর্যটন করিলেন, তিনি বসিয়া বসিয়া তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিলেন, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট যে উদার ধর্ম-মত শিখিয়াছিলাম, তাহা প্রচার করিয়াছি। আমার কাজ শেষ হইয়াছে।

কাজ যখন শেষ হইয়াছে, আর কেন? স্বামী বিবেকানন্দ দেহত্যাগ করিবার জন্য ধ্যানস্থ হইলেন। কিন্তু ধ্যানে বসিয়া যোগীর মন শান্ত হইল না। আমি আর কি করিব? আরও কি কাজ অবশিষ্ট আছে? বিশ্বজগৎ ভুলিয়া তিনি মনকে মায়ার রাজ্য হইতে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিতেছেন, এমন সময় তাঁহার মানস-পটে "বর্তমান ভারত" ফুটিয়া উঠিল। দারিদ্র্য অশিক্ষা অবুদ্ধির অন্ধকারে আচ্ছন্ন

পরাধীন দেশের সমস্ত দুঃখ যেন তাঁহার বুকে বাজিতে লাগিল। ধ্যাননেত্রে তিনি দেখিতে লাগিলেন, "এই আমার ভারতবর্ষ, এই আমার প্রিয় মাতৃভূমি! একদিন এই সুপ্রাচীন সভ্যতার জন্মভূমি ভারতের কত গৌরব ছিল! ধনে মানে বীর্যে গৌরবে বিদ্যায়, উন্নত সমাজব্যবস্থায় পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দেশ এই ভারতের আজ কী দুরবস্থা! ইহাই আমার জন্মভূমি, মাতৃভূমি—ইহার উন্নতির জন্য চেষ্টা না করিয়া লক্ষ কোটি গরীব-দুঃখীর দুঃখ দূর করিবার কথা না ভাবিয়া আমি দেহত্যাগ করিতে চাহিতেছি—আমাকে ধিক্!"

আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে শাক্য-কুমার গৌতম বুদ্ধের বিশাল হৃদয় যেমন ভাবে মানুষের দুঃখ দৈন্য নৈতিক অধঃপতন দেখিয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছিল, ঠিক তেমনি ভাবে ভারতবাসীর পরাধীনতা ও হীনদশা দেখিয়া বিবেকানন্দের বিশাল হৃদয় করুণায় গলিয়া গেল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, আমি কৌপীন-সম্বল দরিদ্র সন্ন্যাসী, আমি কেমন করিয়া এই বিশাল দেশের বিরাট দুঃখরাশি দূর করিব? কিন্তু দেশবাসীর সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করা ছাড়া তিনি আর কোন পথ দেখিতে পাইলেন না। ভাবিলেন, অত্যাচারপীড়িত

উপেক্ষিত জনসাধারণের অন্নেই আমরা জীবন ধারণ করিতেছি, অথচ লক্ষ লক্ষ সন্ন্যাসী আমরা ইহাদের জন্য কিছুই করি না। ইহাদের ধর্মের কথা, পরলোকের কথা শুনাই, ইহলোকের দুর্গতির প্রতিকার করি না। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, "খালি পেটে ধর্ম হয় না, মোটা ভাত মোটা কাপড়ের বন্দোবস্ত চাই।" যে দু'বেলা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না, তাহাকে ধর্মকথা শুনাইয়া কি হইবে? এদেশে ধর্মের অভাব নাই, অভাব শিক্ষার, অভাব অন্নবস্ত্রের।

এই অভাব দূর করিতে হইলে আগে চাই মানুষ, তারপর টাকা। একদল শিক্ষিত দেশপ্রেমিক চরিত্রবান্ যুবক দরিদ্রনারায়ণের সেবায় প্রবৃত্ত হইলে টাকা আপনা হইতেই আসিবে। মুক্তিকামী সন্ন্যাসী মাতৃভূমির সেবকরূপে ধ্যানাসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। প্রত্যেক মহৎ জীবনে যেমন ভাবে পরিবর্তন আসে, তাহাই ঘটিল। নূতন বিবেকানন্দ ভারতবর্ষের দিকে মুখ ফিরাইয়া পুনরায় যাত্রা আরম্ভ করিলেন।

স্বামিজী রামনাদ হইয়া ফরাসী অধিকৃত পন্দিচেরীতে আসিলেন। এইখানে মান্দ্রাজের উচ্চ রাজকর্মচারী মন্মথনাথ ভট্টাচার্যের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। মন্মথবাবু স্বামিজীকে মান্দ্রাজে লইয়া

আসিলেন। স্বামিজীর প্রতিভা, পাণ্ডিত্য ও উদার সামাজিক মতগুলি ক্রমে এক শ্রেণীর শিক্ষিত যুবক ও অধ্যাপকদের উপর প্রভাব বিস্তার করিল। এই সন্ন্যাসী বিশেষ পূজা-ধ্যান-জপ অপেক্ষা মানুষের সেবার উপরই বেশী জোর দেন—ধর্ম, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান আলোচনা করেন—এই সব কথা মুখে মুখে ছড়াইয়া পড়িল। মান্দ্রাজের খৃষ্টান কলেজের বিজ্ঞানের অধ্যাপক নাস্তিক সিঙ্গরাভেলু মুদালিয়র স্বামিজীর সহিত তর্ক করিতে আসিয়া তাঁহার শিষ্য হইলেন। এইভাবে কয়েকজন শিক্ষিত যুবক স্বামিজীর আদর্শে সেবাধর্মের দীক্ষা গ্রহণ করিলেন।

এই সময় আমেরিকার শিকাগো সহরে মহামেলার সহিত এক বিশ্বধর্মসভার আয়োজন হইতেছিল। পৃথিবীর যাবতীয় ধর্মসম্প্রদায়ের যোগ্য প্রতিনিধিদের এই সভায় নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। স্বামিজীর শিষ্যরা তাঁহাকে হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিরূপে ধর্মসভায় পাঠাইবার জন্য উৎসাহী হইয়া উঠিলেন। ভারতের বাণী পাশ্চাত্ত্যদেশে প্রচার করিবার এই সুযোগ স্বামিজী গ্রহণ করিলেন। এমন সময় একদিন খেতরীর রাজা বাহাদুরের সেক্রেটারী মুন্সী জগমোহন লাল মান্দ্রাজে

আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং আমেরিকা যাত্রার সমস্ত বন্দোবস্তের ভার লইলেন। স্বামিজী শিষ্য-দের নিকট বিদায় লইয়া খেতরীতে রাজপুত্রের অন্নপ্রাশন উৎসবে উপস্থিত হইলেন, তারপর মুন্সিজীর সহিত বোম্বাইতে আসিলেন। জাহাজে একটি প্রথম শ্রেণীর কেবিন পূর্বেই রিজার্ভ করা হইয়াছিল। মুন্সিজী স্বামিজীর বক্তৃতা দিবার জন্য রেশমের আলখাল্লা ও পাগড়ী তৈয়ার করাইলেন। শীতের দেশের উপযোগী বসন-ভূষণ তৈয়ার হইল। সব ঠিকঠাক করিয়া মুন্সিজী ও তাঁহার মান্দ্রাজী শিষ্যগণ তাঁহাকে বিদায় দিলেন। স্বামিজী জাহাজের ডেকের উপর দাঁড়াইয়া স্বদেশের তটভূমি দেখিতে লাগিলেন, তাঁহার চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল।

ভারতের প্রতিনিধি বিবেকানন্দ

১৮৯৩ সালের ৩১শে মে বোম্বাই হইতে জাহাজ ছাড়িল। বিষণ্ণ বিমর্ষ সন্ন্যাসী বিব্রত হইয়া উঠিলেন। দণ্ড, কমণ্ডলু এবং গেরুয়া কাপড়ে মোড়া দু'চারখানা পুঁথি ছাড়া কোন সম্বল যাঁহার ছিল না, বাক্স-পেঁটরা কাপড়-চোপড় সামলাইতে তাঁহার চিরদিনের অভ্যাসের সহিত বিরোধ বাধিল। অন্যান্য যাত্রী ও জাহাজের কাপ্তেনের সহায়তায় তিনি শীঘ্রই নূতন জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হইয়া উঠিলেন।

বোম্বাই হইতে ভারত মহাসমুদ্র অতিক্রম করিয়া, মালয় উপদ্বীপের পিনাং সিঙ্গাপুর হইয়া, জাহাজ হংকঙ বন্দরে নোঙ্গর করিল। এখানে জাহাজ তিন-দিন থাকিবে জানিয়া স্বামিজী দক্ষিণ চীনের রাজধানী ক্যাণ্টন দেখিয়া আসিলেন। চীনদেশের অবস্থার সহিত ভারতের তুলনা করিয়া তিনি এক পত্রে লিখিয়াছেন, "চীন ও ভারতবাসী যে সভ্যতা-সোপানে একপদও অগ্রসর হইতে পারিতেছে না, দারিদ্র্যই তাহার একমাত্র কারণ। সাধারণ হিন্দু বা

চীনার পক্ষে তাহার প্রাত্যহিক অভাবই তাহার সময়ের এতদূর ব্যাপৃত করিয়া রাখে যে, তাহাকে আর কিছু ভাবিবার অবসর দেয় না।”

হতদরিদ্র ভারত ও চীনের পর উন্নতিশীল জাপানের নাগাসিকি, কোবি, ইয়াকোহামা, ওসাকা, কিয়াটো ও টোকিয়ো এই কয়েকটি নগর ও বন্দর দেখিয়া স্বামিজী মুগ্ধ হইলেন। সহরগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, বাড়ীঘর ছবির মত মনোহর, রাস্তাগুলি চওড়া ও সিধা। জাপানীরা সাহসী, স্বদেশপ্রেমিক, কর্মপ্রবণ এবং যন্ত্রকুশলী। জাপানের উন্নতি ও স্বদেশের দুর্গতির তুলনা করিয়া স্বামিজী তাঁহার মান্দ্রাজী শিষ্যদের লিখিলেন, “আমাদের দেশের যুবকেরা দলে দলে এসে জাপান দেখে যাক। এরা কি ভাবে দেশের উন্নতি করছে।

“ * * * আর তোমরা কি করছো! সারা জীবন কেবল বাজে বোক্‌ছো। এস, এদের দেখে যাও, তারপর যাও, গিয়ে লজ্জায় মুখ লুকোও গে। ভারতের যেন জরাজীর্ণ অবস্থা হয়ে ভীমরতি ধরেছে! তোমরা দেশ ছেড়ে বাইরে গেলে তোমাদের জাতি যায়!! হাজার বছরের জমাট কুসংস্কারের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে বসে আছ, হাজার হাজার বছর ধরে খাদ্যাখাদ্যের শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার করে শক্তি ক্ষয়

কোরছো। পৌরোহিত্যরূপ আহাম্মকির গভীর ঘূর্ণিতে ঘুরপাক খাচ্ছো। শত শত যুগের সামাজিক অত্যাচারে তোমাদের সব মনুষ্যত্বটা একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে—তোমাদের কি আছে বল দেখি! আর তোমরা এখন কোরছোই বা কি? আহাম্মক, তোমরা বই হাতে করে সমুদ্রের ধারে পাইচারী কোরছো! ইয়োরোপীয়-মস্তিষ্ক-প্রসূত কোন তত্ত্বের এক কণা মাত্র—তাও খাঁটি জিনিষ নয়— সেই চিন্তার বদহজম খানিকটা ক্রমাগত আওড়াচ্ছো, আর তোমাদের প্রাণ-মন সেই ৩০৲ টাকার কেরাণীগিরির উপরে পড়ে আছে; না হয় খুব জোর একটা দুষ্ট উকীল হবার মতলব করছো। এই হ'লো ভারতীয় যুবকগণের সর্বোচ্চ দুরাকাঙ্ক্ষা। আবার প্রত্যেক ছেলের আশে পাশে একপাল ছেলে—তার বংশধরগণ—বাবা, খাবার দাও খাবার দাও করে উচ্চ চীৎকার তুলছে!! বলি, সমুদ্রে কি জলের অভাব হয়েছে যে তোমাদের বই, গাউন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপ্লোমা প্রভৃতি সব ডুবিয়ে ফেলতে পারো না!

"এস, মানুষ হও। প্রথমে দুষ্ট পুরুতগুলোকে দূর করে দাও। কারণ এই মস্তিষ্কহীন লোকগুলো কখনও ভাল কথা শুনবে না—তাদের হৃদয় শূন্যময় —তার কখনও প্রসার হবে না। শত শত শতাব্দীর

কুসংস্কার ও অত্যাচারের মধ্যে তাদের জন্ম; আগে তাদের নির্মূল কর। এস, মানুষ হও। নিজেদের সংকীর্ণ গর্ত থেকে বেরিয়ে এসে বাইরে গিয়ে দেখ সব জাতি কেমন উন্নতির পথে চলেছে! তোমরা কি মানুষকে ভালবাসো? তোমরা কি দেশকে ভালবাসো? তা'হলে এস আমরা ভাল হবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করি। পেছনে চেয়ো না—অতি প্রিয় আত্মীয়-স্বজন কাঁদে কাঁদুক, পেছনে চেয়ো না—সামনে এগিয়ে যাও। ভারতমাতা এইরূপ সহস্র যুবক বলি চান! মনে রেখো, মানুষ চাই, পশু নয়।"

ইয়াকোহামা হইতে প্রশান্ত মহাসাগর পার হইয়া জাহাজ বঙ্কুবর বন্দরে নোঙগর ফেলিল। বিবেকানন্দ কানাডার মধ্য দিয়া রেলপথে শিকাগোয় আসিলেন। কয়েকমাস পরেই যে নগর হইতে তাঁহার খ্যাতি দেশ বিদেশে ঘোষিত হইবে, সেখানে অপরিচিত সন্ন্যাসী অসহায় বালকের মত বিব্রত হইয়া উঠিলেন। আরও বিপদ, টাকা পয়সা কিভাবে ব্যবহার করিতে হয় তিনি জানিতেন না। কুলি হইতে হোটেলওয়ালা সকলেই তাঁহাকে ঠকাইতে লাগিল।

তাঁহার টাকা ফুরাইয়া আসিল; অথচ তখনও ধর্মসভার অধিবেশন হইতে তিনমাস বাকী। তিনি

আরও জানিলেন, ধর্মমহাসভার নিয়মমত পরিচয়পত্র যাঁহারা আনেন নাই, তাঁহাদের প্রতিনিধিরূপে গ্রহণ করা হইবে না। তথাপি স্বামিজী বিশ্বাস হারাইলেন না। তিনি ভাবিলেন, এই তিনমাস সহর ছাড়িয়া গ্রামে থাকিলে খরচ কম হইবে। গ্রামে ভিক্ষাও পাওয়া যাইবে। ইতিমধ্যে তাঁহার শিষ্যরা টাকা পাঠাইবার ব্যবস্থাও করিবেন।

স্বামিজী শিকাগো হইতে বোষ্টন চলিয়াছেন, পথে রেলগাড়ীতে এক বৃদ্ধা ভদ্রমহিলার সহিত তাঁহার আলাপ হইল। ভারত হইতে তিনি আমেরিকায় হিন্দুধর্ম ও বেদান্ত প্রচার করিতে আসিয়াছেন শুনিয়া মহিলাটি কৌতূহলী হইয়া স্বামিজীকে নিজের বাড়ীতে লইয়া আসিলেন। আহার ও আশ্রয় দুইই মিলিল। এখান হইতে তিনি একজন শিষ্যকে লিখিয়াছিলেন, "এখানে আসিবার পূর্বে যে সকল সোনার স্বপন দেখিতাম, তাহা ভাঙ্গিয়াছে—এক্ষণে অসম্ভবের সহিত যুদ্ধ করিতে হইতেছে। শত শতবার মনে হইয়াছিল এদেশ হইতে চলিয়া যাই। কিন্তু আবার মনে হয় আমি একগুঁয়ে দানা, আর আমি ভগবানের আদেশ পাইয়াছি। আমার দৃষ্টিতে কোন পথ লক্ষিত হইতেছে না বটে, কিন্তু তাঁহার চক্ষু তো সব দর্শন

করিতেছে। মরি বাঁচি উদ্দেশ্য ছাড়িতেছি না।"

এই মহিলার বাড়ীতে একদিন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মিঃ রাইটের সহিত স্বামিজীর আলাপ হইল। স্বামিজীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়া তিনি বলিলেন, আপনি যাহাতে হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিরূপে শিকাগো ধর্মমহাসভায় যোগ দিতে পারেন, আমি সে ব্যবস্থা করিয়া দিব। মিঃ রাইট ধর্মমহাসভার কর্মকর্তাদের একজনের নিকট একখানি পত্র দিলেন। তাহাতে তিনি লিখিলেন, "দেখিলাম, এই অজ্ঞাতনামা হিন্দু সন্ন্যাসী আমাদের সকল পণ্ডিতগুলি একত্র করিলে যাহা হয়, তদপেক্ষাও অধিক পণ্ডিত।" স্বামিজী এই পত্র লইয়া পুনরায় শিকাগো যাত্রা করিলেন।

স্বামিজী রাত্রে শিকাগো সহরে আসিয়া হোটেলে জায়গা পাইলেন না। সকলেই তাঁহাকে নিগ্রো মনে করিয়া ঘৃণায় কথা কহিল না। স্বামিজী বড়ই বিপদে পড়িলেন। রাত্রিতে ভয়ানক শীত, ক্রমে বরফ পড়িতে লাগিল। তাঁহার গায়ে সামান্য গেরুয়া কাপড়; এই শীতে মৃত্যু অনিবার্য। অগত্যা রেল ষ্টেশনে একটা খালি কাঠের বাক্সের মধ্যে ঢুকিয়া কোন মতে রাত কাটাইলেন। সকাল বেলায় শীতে ক্ষুধায় কাতর হইয়া রাস্তায় বাহির হইলেন।

সে দেশের লোক ভিক্ষা দেয় না। কেহই তাঁহার কষ্ট দেখিয়া দয়া করিল না। কিছুক্ষণ পর বিবেকানন্দ আর হাঁটিতে না পারিয়া রাস্তায় বসিয়া পড়িলেন ও মনে মনে ভগবানকে ডাকিতে লাগিলেন। এমন সময় শিকাগো সহরের এক মহাধনীর স্ত্রী সেই পথ দিয়া যাইতে যাইতে বিবেকানন্দকে দেখিলেন। স্বামিজীর শুষ্ক কাতর মুখ দেখিয়া ইঁহার হৃদয় গলিয়া গেল এবং ধীরে ধীরে কাছে আসিয়া সব জিজ্ঞাসা করিলেন। স্বামিজী তাঁহার নিকট সব খুলিয়া বলিলেন। এই মহিলা স্বামিজীকে নিজের বাড়ীতে লইয়া গেলেন এবং নিজের ছেলের মত যত্ন করিতে লাগিলেন। ইহার পর স্বামিজীর আর কোন কষ্ট হয় নাই।

শিকাগোর বিরাট ধর্মসভায় সমস্ত পৃথিবীর বহু বড় বড় বক্তা ও পণ্ডিত একত্র হইয়াছিলেন। সকলের চেয়ে স্বামিজীই বয়সে ছোট। তাঁহার বয়স তখন ৩০ বৎসর মাত্র। অনেকেই ভাবিলেন যে, এ ছেলেমানুষ আবার কি বক্তৃতা করিবে? বিবেকানন্দের মনেও বড় ভয় হইল। কারণ তিনি জীবনে কখনো বক্তৃতা করেন নাই। বিশেষ এই আট দশ হাজার শিক্ষিত নরনারীর সম্মুখে তিনি কেমন

করিয়া বক্তৃতা করিবেন? বিবেকানন্দ মনে মনে দেবী সরস্বতীকে ডাকিতে লাগিলেন। তারপর ভগবানকে প্রণাম করিয়া বক্তৃতা করিতে দাঁড়াইলেন। তিনি যখন প্রথমেই বলিয়া উঠিলেন, "হে আমেরিকাবাসী ভ্রাতা ও ভগ্নিগণ—" তখন সেই আট দশ হাজার লোক আনন্দে হাততালি দিয়া উঠিল। তারপর বিবেকানন্দ যে বক্তৃতা করিলেন, তাহা শুনিয়া সকলেই তাঁহাকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। সমস্ত পৃথিবীর লোক স্বামিজীর নাম জানিতে পারিল। তাঁহাকে দেখিবার জন্য প্রত্যহ হাজার হাজার লোক আসিতে লাগিল। তাঁহার মুখের একটা উপদেশ শুনিবার জন্য সকলেই আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল। স্বামিজীর মুখে হিন্দু-ধর্মের কথা শুনিয়া সকলে অবাক হইল। হিন্দুধর্ম যে সত্য এবং শ্রেষ্ঠ তাহা অনেকেই বুঝিতে পারিল। ইতিপূর্বে এ দেশ হইতে খৃষ্টান পাদ্রী সাহেবরা বিলাত আমেরিকায় গিয়া হিন্দুদের অনেক মিথ্যা নিন্দা প্রচার করিতেন। সাধারণ লোক তাহা বিশ্বাস করিত এবং মনে করিত যে হিন্দুরা বড়ই অসভ্য ও কদাচারী। কিন্তু বিবেকানন্দকে দেখিয়া ও তাঁহার কথা শুনিয়া সকলেই প্রকৃত সত্য বুঝিতে পারিল। আমেরিকার নানা সহরে বিবেকা-

নন্দ হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে লাগিলেন। তাঁহার উপদেশ ও চরিত্রে মুগ্ধ হইয়া অনেক সাহেব ও বিবি হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিতে লাগিলেন। খবরের কাগজে প্রত্যহ তাঁহার প্রশংসা হইতে লাগিল। আমেরিকার বড় বড় পণ্ডিত ও ধার্মিকগণ বিবেকানন্দের উপদেশ শুনিতে লাগিলেন। চারিদিকে বিবেকানন্দের নামে ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল। বিবেকানন্দের এত প্রশংসা ও প্রতিপত্তি দেখিয়া পাদ্রী সাহেবগণ হিংসায় জ্বলিতে লাগিলেন এবং তাঁহার নানাপ্রকার নিন্দা প্রচার করিতে লাগিলেন। কিন্তু বিবেকানন্দ তাহাতে ভয় পাইলেন না। তিনি আপন মনে নিজের কাজ করিয়া যাইতে লাগিলেন। সত্য কথা প্রকাশ করিতে তিনি কোন দিনই ভয় করিতেন না। এইরূপে দুই বৎসর আমেরিকায় ধর্ম প্রচার করিয়া বিবেকানন্দ ইংলণ্ডে আসিলেন। ইংলণ্ডের ধর্মপ্রাণ নরনারিগণ স্বামিজীকে খুব সমাদর করিলেন। এইখানেই স্বামিজীর সঙ্গে মিস্ নোবলের পরিচয় হয়। মিস্ নোবল অসাধারণ পণ্ডিতা ও সৎস্বভাবা ছিলেন। ইনি স্বামিজীর শিষ্যা হইয়া সিষ্টার নিবেদিতা নামে পরিচিতা হন। ইনি এ দেশের মেয়েদের লেখাপড়া শিখাইবার জন্য জীবন উৎসর্গ করেন।

একদিন স্বামিজী সুবিখ্যাত পণ্ডিত মোক্ষমূলরের সহিত দেখা করিবার জন্য লণ্ডন হইতে অক্সফোর্ডে গমন করেন। পণ্ডিত মোক্ষমূলর পূর্ব হইতেই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন। এখন তাঁহার একজন কৃতী শিষ্যের দর্শন পাইয়া অতীব আনন্দিত হইলেন। স্বামিজীর সঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধে অনেক কথাবার্তা হইল। স্বামিজী যখন লণ্ডনে ফিরিবার জন্য অক্সফোর্ডের রেল-ষ্টেশনে আসিলেন, তখন অল্প অল্প বৃষ্টি হইতেছিল। বিবেকানন্দ যখন গাড়ীতে উঠিবেন, তখন দেখেন যে, পণ্ডিত মোক্ষমূলর তাঁহাকে বিদায় দিবার জন্য ষ্টেশনে আসিয়াছেন। স্বামিজী তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন, আপনি বুড়া মানুষ, এই শীতে বৃষ্টিতে ভিজিয়া কেন ষ্টেশনে আসিয়াছেন? তিনি সজল নয়নে স্বামিজীর হাত ধরিয়া বলিলেন, "রামকৃষ্ণ পরমহংসের শিষ্য তো রোজ রোজ দেখিতে পাইব না।" সত্যই স্বামিজীর মধুর ব্যবহারে সকলেই তাঁহাকে ভালবাসিত। যে বাড়ীতে তিনি দু'একদিন থাকিতেন, তাঁহারাই বিবেকানন্দকে এত আপনার মনে করিতেন যে, বিদায় দিতে কষ্ট হইত। এত মান-সম্মান পাইয়াও স্বামিজীর মনে এতটুকুও অহঙ্কার ছিল না। তিনি ছোট বড় গরীব ধনী

সকলের সঙ্গেই সমান ভাবে মিশিতেন, সকলকেই সমান আদর করিতেন, বরং গরীব দেখিলে তিনি তাহাকে বেশী আদর করিতেন।

ক্রমাগত ৩।৪ বৎসর বক্তৃতা ও নানাস্থানে ভ্রমণ করায় স্বামিজীর স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল। বায়ু-পরিবর্তনের জন্য শিষ্যগণ তাঁহাকে সুইজারল্যাণ্ডে লইয়া গেলেন। সেখানে কিছুদিন থাকিয়া স্বামিজী ইতালি, ফ্রান্স, জার্মেনী ইত্যাদি দেশ ভ্রমণ করিয়া পুনরায় ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসিলেন।

জার্মেনীতে স্বামিজী একদিন অদ্ভুত স্মৃতি-শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন, যাহা শুনিলে তোমরা অবাক হইবে। জার্মেনীর প্রসিদ্ধ বেদান্তের পণ্ডিত অধ্যাপক পল ডয়সন স্বামিজীর খ্যাতির কথা শুনিয়া একদিন তাঁহাকে নিজ বাটীতে নিমন্ত্রণ করেন। সকাল বেলায় স্বামিজী তাঁহার বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। পড়িবার ঘরে কিছুক্ষণ গল্প করিবার পর অধ্যাপক কোন বিশেষ কাজে কিছু-ক্ষণের জন্য উঠিয়া গেলেন। স্বামিজী টেবিলের উপর হইতে একখানি বই তুলিয়া লইয়া পড়িতে লাগিলেন। স্বামিজীর পড়াও অদ্ভুত রকম ছিল। দেখিলে মনে হইত, তিনি যেন কেবল পাতা উল্টাইতেছেন। কিন্তু তিনি খুব তাড়াতাড়ি পড়িতে

পারিতেন। এত তাড়াতাড়ি পড়া যে মানুষে পারে ইহা অধ্যাপক কোনদিন দেখেন নাই; কাজেই স্বামিজীকে বইএর পাতা উল্টাইতে দেখিয়া কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তিনি কয়েকবার স্বামিজীকে ডাকিলেন, কিন্তু কোন উত্তর পাইলেন না। কেননা, স্বামিজী পড়িবার সময় এত মনোযোগ দিয়া পড়িতেন, কেহ ডাকিলে বা কোন শব্দ হইলে শুনিতে পাইতেন না। যাহা হউক, এক ঘণ্টার মধ্যে চারিশত পৃষ্ঠার বইখানি শেষ করিয়া স্বামিজী মুখ তুলিয়া দেখেন, অধ্যাপক বসিয়া আছেন। তিনি লজ্জিত হইয়া বলিলেন, "আপনি অনেকক্ষণ বসিয়া আছেন; আমি পড়িতেছিলাম, তাই টের পাই নাই—ক্ষমা করিবেন।"

অধ্যাপক হাসিয়া বলিলেন, স্বামিজী, অনেককে পড়িতে দেখিয়াছি, কিন্তু আপনার মত পড়িতে কাহাকেও দেখি নাই! আপনি তো পাতা উল্টাইতে-ছিলেন, পড়িলেন কখন?

স্বামিজী বুঝিলেন যে, অধ্যাপক তাঁহার কথা বিশ্বাস করিতেছেন না। অগত্যা বলিলেন, তা' আমি বইখানা পড়িয়াছি কি না, আপনি পরীক্ষা করিতে পারেন। বইএর যে কোন পৃষ্ঠা হইতে আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করুন। অধ্যাপক বিস্মিত হইয়া

পুঁথিখানা তুলিয়া লইলেন, এবং বইএর নানা জায়গা হইতে স্বামিজীকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। পৃষ্ঠার নাম শুনিবামাত্র স্বামিজী ঐ পৃষ্ঠায় যাহা লেখা আছে, তাহা অবিকল মুখস্থ বলিতে লাগিলেন! অধ্যাপকের বিস্ময়ের সীমা রহিল না! ঐ বইএর কবিতাগুলি তাঁহাকে অনর্গল আবৃত্তি করিতে দেখিয়া অধ্যাপক আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, স্বামিজী, এই বইখানা আপনি কি আগে কখনো পড়িয়াছিলেন? তা' না হইলে এই সময়ের মধ্যে ৪০০ পৃষ্ঠার একখানা পুস্তক আপনি মুখস্থ করিলেন কেমন করিয়া?

স্বামিজী হাসিয়া বলিলেন, সংযতমনা যোগীর পক্ষে ইহা মোটেই অসম্ভব নয়। আপনি জানেন, আমি কামকাঞ্চনত্যাগী সন্ন্যাসী। আজীবন অখণ্ড ব্রহ্মচর্যের ফল স্বরূপ আমি এই ক্ষমতা লাভ করিয়াছি। এদেশের সাহেবরা ইহা বিশ্বাস নাও করিতে পারেন। কিন্তু ঠিক ঠিক ব্রহ্মচর্য পালন করিলে যে এইরূপ স্মৃতিশক্তি লাভ করা যায়, ইহা হিন্দুরা বিশ্বাস করেন।

অধ্যাপক স্বামিজীর উত্তরে সন্তুষ্ট হইলেন। ব্রহ্মচর্য পালন করিলে যে ঐরূপ স্মৃতিশক্তি হয়, তাহা তিনি শাস্ত্রে পড়িয়াছিলেন, কিন্তু বিশ্বাস

করিতে পারেন নাই। স্বামিজীকে দেখিয়া তাঁহার ভুল দূর হইল।

স্বামিজী ইংলণ্ডে ফিরিয়া পুনরায় প্রচারকার্য আরম্ভ করিলেন। নিউইয়র্ক, বোষ্টন প্রভৃতি সহরে বিবেকানন্দ যে কয়েকটি প্রচারকেন্দ্র স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার কাজ ভালই চলিতেছিল। স্বামিজীর কাজে সহায়তা করিবার জন্য ভারত হইতে তাঁহার গুরুভ্রাতা স্বামী সারদানন্দ ও স্বামী অভেদানন্দ ইংলণ্ডে আসিলেন। বিবেকানন্দের প্রচারকার্যের ফলে বৃটেন ও আমেরিকায় ভারতীয় সভ্যতা, ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি শিক্ষিত নরনারীদের অনুরাগ বৃদ্ধি হইল। কেবল বক্তৃতার শক্তিতে ইহা সম্ভব হয় নাই; স্বামিজীর গভীর সত্যানুরাগ এবং সর্বসাধারণের প্রতি অকপট প্রেমই তাঁহাকে জনপ্রিয় করিয়াছিল।

ভগিনী নিবেদিতা লিখিয়াছেন, "আচার্যদেব তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তগণের হৃদয়ে যে অমূল্য স্মৃতির সম্ভার রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার মধ্যে মনুষ্যজাতির প্রতি প্রেমই যে উজ্জ্বলতম রত্ন, তাহা আমরা অসঙ্কোচে নির্দেশ করিতে পারি।" আমেরিকার ব্রুকলীন সহরের এক পণ্ডিত ব্যক্তি ভারতের "ব্রহ্মবাদিন্" পত্রিকায় স্বামিজী সম্বন্ধে

লিখিয়াছিলেন, ঈশ্বর দয়া করিয়া এই ধর্মপ্রচারক ও লোকশিক্ষককে আমাদের দেশে পাঠাইয়াছেন; ইঁহার উন্নততর দার্শনিক মতবাদ আমাদের দেশের নৈতিক জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। বিবেকানন্দ আমাদের মধ্যে এমন এক ধর্মপ্রচার করিতেছেন, যাহা সম্প্রদায় ও মতবাদের বন্ধন হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত, পবিত্র ও উন্নত জীবন গঠন করিয়া সকল মানুষকে সমানভাবে ভালবাসাই তাহার মূল কথা। স্বামিজী তাঁহার শিষ্য ও ভক্তগণ ছাড়াও বহু বন্ধু লাভ করিয়াছেন। ভ্রাতৃভাবের সাম্য লইয়া তিনি সমাজের সর্বস্তরের লোকের সহিত মিশিয়াছেন। প্রশংসা বা নিন্দায় তিনি বিচলিত হন না, তিনি অনাসক্ত অথচ অপার করুণাময়।

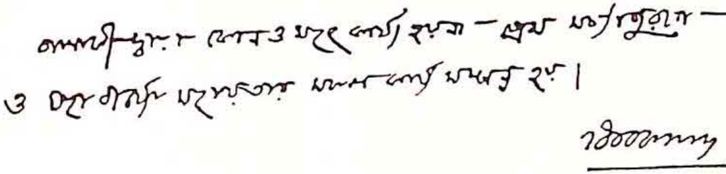
এই সময় যে সকল পণ্ডিত ও চরিত্রবান্ শ্বেতাঙ্গ নরনারী স্বামিজীর সঙ্গলাভ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই একবাক্যে বলিয়াছেন, তিনি সর্বদাই দীন দরিদ্র পতিতদের প্রতি লোকের মনে সহানুভূতি জাগাইবার চেষ্টা করিতেন, তাঁহার মুখ হইতে আশীর্বাদ ছাড়া কখনও অভিশাপ উচ্চারিত হয় নাই। নাট্য-সম্রাট্ গিরীশচন্দ্র ঘোষ একদিন কথাপ্রসঙ্গে আমাদের বলিয়াছিলেন, "তোদের স্বামিজীকে অদ্ভুত প্রতিভাশালী বেদান্তের পণ্ডিত

বলিয়া ভালবাসি না, তাঁহার করুণায় সতত-দ্রব হৃদয়ের জন্যই তাঁহাকে ভালবাসি।"

চারি বৎসর কাল পাশ্চাত্ত্য দেশে হিন্দুর প্রকৃত ধর্ম ও ভারতবর্ষের বাণী প্রচার করিয়া ইংলণ্ডের শিষ্য শিষ্যাদের নিকট বিদায় লইয়া স্বামিজী স্বদেশে যাত্রা করিলেন। এই সময় একজন ইংরাজ বন্ধু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "স্বামিজী, চার বৎসর বিলাসের লীলাভূমি অপ্রতিহত-প্রতাপ পাশ্চাত্ত্যভূমিতে ভ্রমণের পর আপনার মাতৃভূমি কেমন লাগিবে?" স্বদেশপ্রেমিক সন্ন্যাসী স্নিগ্ধ কণ্ঠে উত্তর দিলেন,—"এ দেশে আসিবার পূর্বে আমি ভারতকে ভালবাসিতাম; এখন ভারতের ধূলি-কণা পর্যন্ত আমার নিকট পবিত্র, ভারতের বাতাস আমার নিকট পবিত্রতা-মাখা—ভারত এখন আমার নিকট তীর্থস্বরূপ।"

ভারতে বিবেকানন্দ—স্বদেশের হিতসাধন

স্বামী বিবেকানন্দ বিলাত হইতে দেশে ফিরিতেছেন, এ সংবাদ প্রচারিত হইবামাত্র দক্ষিণ ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান নগরে তাঁহাকে সমুচিত অভ্যর্থনা করিবার আয়োজন চলিতে লাগিল। তিনি যে পাশ্চাত্ত্য দেশে হিন্দুধর্ম প্রচার করিয়া আশাতীত সাফল্য লাভ করিয়াছেন, এ সংবাদ সকলেই পাইয়াছিলেন। বিশেষ কথা, স্বামী বিবেকানন্দের পূর্বে আর কোন হিন্দু সন্ন্যাসী হিন্দুধর্ম প্রচার করিবার জন্য বিদেশে যান নাই। এদিকে বিবেকানন্দ কিন্তু অভ্যর্থনার বিষয়ে বিন্দুমাত্র জানিতেন না। তিনি যখন জাহাজ হইতে সিংহলের কলম্বো বন্দরে অবতরণ করিলেন, তখন দেখিলেন, সহস্র সহস্র লোক সমুদ্রতীরে দাঁড়াইয়া আছে। তাঁহাকে দেখিবামাত্র সকলে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। সিংহলের খ্যাতনামা নেতা মাননীয় কুমারস্বামী মহাশয় তাঁহাকে ফুলের মালায় ভূষিত করিলেন —তখন বিবেকানন্দ বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহাকে দেখিবার জন্যই এত লোক আসিয়াছে। তারপর



[স্বামিজীর হস্তাক্ষর]

বিবেকানন্দকে সকলে এক বিরাট মণ্ডপে লইয়া গেলেন। সেই সভায় বক্তৃতা করিতে গিয়া বিবেকানন্দ বলিলেন, আমি কোন রাজা, মহারাজা, ধনী বা বিখ্যাত লোক নই—আমি একজন সন্ন্যাসী ফকির। আপনারা যে আমাকে এত আদর করিয়া অভ্যর্থনা করিলেন, তাহাতে আমি বুঝিতেছি যে, হিন্দুজাতি এখনো তাহার ধর্ম হারায় নাই—তাহা না হইলে একজন সন্ন্যাসীর প্রতি এত শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিবে কেন? সেইজন্য আনন্দের সহিত হিন্দুদের বলিতেছি, "তোমরা দীন দরিদ্র হও ক্ষতি নাই, কিন্তু ধর্ম হারাইও না। ধর্মকে চিরদিন রক্ষা করিও।"

কলম্বো হইতে স্বামিজী সিংহলের কয়েকটি নগরে গেলেন। সব জায়গাতেই হাজার হাজার লোক তাঁহার নিকট আসিতে লাগিল। তিনি সকলকেই ধর্মোপদেশ দিয়া সুখী করিলেন। তারপর তিনি সিংহল বা লঙ্কাদ্বীপ হইতে বোটে সমুদ্র পার হইয়া ভারতের মৃত্তিকায় পদার্পণ করিলেন। সমুদ্রতীরে পাম্বান সহরে রামনাদের রাজা স্বামিজীর শিষ্য মহারাজ ভাস্করবর্মা সেতুপতি গুরুদেবের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। স্বামিজী মাটিতে নামিবামাত্র তিনি ভূমিতে লুটাইয়া স্বামিজীকে

প্রণাম করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে সহস্র ব্যক্তি মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। রাজা বাহাদুর স্বামিজী প্রথম যে স্থলে পা রাখিয়াছেন সেখানে একটি প্রকাণ্ড স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করিয়া দিলেন। স্বামিজী বহুদিন পর রাজশিষ্য ও পরিচিত অন্যান্য সকলের সহিত মিলিত হইলেন। এইরূপে কয়েকটি নগরীতে নানাভাবে অভ্যর্থিত হইয়া ও বক্তৃতা করিয়া স্বামিজী মান্দ্রাজে আসিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দ বিলাত হইতে স্বদেশে ফিরিয়া আসিতেছেন, এই সংবাদ পাইয়া মান্দ্রাজ নগরী তাঁহাকে উপযুক্ত অভ্যর্থনা করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। ভারতমাতার অন্যতম সুসন্তান মান্দ্রাজ হাইকোর্টের জজ্ মাননীয় সুব্রহ্মণ্য আয়ার মহোদয় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন। স্বামিজী ষ্টেশনে নামিবামাত্র সুব্রহ্মণ্য আয়ার ও অন্যান্য সদস্যগণ অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে পুষ্পমাল্যভূষিত করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সহস্র সহস্র দর্শক জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। স্বামিজী মান্দ্রাজে ক্রমে ছয়টি বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতাগুলি পাঠ করিলে বোঝা যায় স্বদেশের কল্যাণের জন্য তিনি প্রত্যেক ভারতবাসীকে কোন পথ অবলম্বন করিতে পরামর্শ

দিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন যে, আজকালকার স্কুল কলেজে যে ধর্মহীন, নীতিহীন এক প্রকার শিক্ষা দান করা হইতেছে, উহা আমাদের জাতীয় উন্নতির প্রধান প্রতিবন্ধক। উহাতে আমাদের দেশের বালক ও যুবকগণের চরিত্রের মেরুদণ্ড ভাঙিয়া যাইতেছে, যাহাতে স্বদেশী ভাবে শিক্ষার প্রচলন হয় তদুদ্দেশ্যে সমস্ত শিক্ষার ভার স্বহস্তে লইতে হইবে। তাঁহার অন্যান্য উপদেশগুলি বিস্তারিত ভাবে এই ক্ষুদ্র পুস্তকে আলোচনা করা অসম্ভব।

কয়েকদিন মান্দ্রাজে শিষ্য ও ভক্তমণ্ডলীর সহিত থাকিয়া তিনি কলিকাতাভিমুখে রওনা হইলেন। কলিকাতাবাসীরাও তাঁহাকে যথাযোগ্য সাদর অভ্যর্থনা করিতে চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। তাঁহার কলিকাতা আসিবার এক সপ্তাহ পরে স্যার রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের বাটীতে এক প্রকাণ্ড সভা আহূত হইল। প্রায় দশহাজার লোক স্বামিজীকে দেখিবার জন্য সমবেত হইয়াছিলেন। রাজা বিজয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর অভিনন্দনপত্র পাঠ করিলে পর স্বামিজী এক বক্তৃতা দিলেন। এই বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছিলেন, আমি সন্ন্যাসী হইয়া আত্মীয়স্বজন হইতে বহুদূর চলিয়া গিয়াছিলাম, মুক্তি কামনায় সমস্ত ভুলিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা

পারি নাই, আমার কানে সর্বদাই কে যেন বলিত, "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।" সত্যই বিবেকানন্দ দেশপ্রেমিক সন্ন্যাসী ছিলেন। দেশের দুঃখকষ্টের কথা শুনিলে বিবেকানন্দের চক্ষে জল আসিত, তিনি কাতরস্বরে প্রায়ই বলিতেন, "আমি মুক্তি চাই না—জননী জন্মভূমির সেবা করাই আমার জীবনের একমাত্র কর্ম।" এই সংকল্প বিবেকানন্দ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়া গিয়াছেন। তিনি দেশকে ভালবাসিতেন, দেশের কল্যাণের জন্য কাজ করিতেন বলিয়াই তো আজও শত সহস্র ব্যক্তি ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার পুণ্যচরিত শ্রবণ করিয়া থাকে।

কলিকাতায় আসিয়া স্বামিজী নানাস্থানে ঘুরিয়া বক্তৃতা না দিয়া আলমবাজার মঠে বাস করিতে লাগিলেন এবং প্রত্যহ সমাগত শিক্ষিত যুবকগণকে দেশের কাজে অগ্রসর হইবার জন্য উৎসাহ দিতে লাগিলেন। স্বামিজী বুঝিয়াছিলেন যে, সংসারের দশটা কাজের সঙ্গে দেশের কাজ করাও মন্দ নহে, কিন্তু দেশের যে-রকম অবস্থা তাহাতে ঐরূপ কাজে বিশেষ ফল হইবে না। দেশের ও দশের সেবা করিবার জন্য কতকগুলি সর্বত্যাগী শিক্ষিত যুবকের প্রয়োজন—যাহারা সংসারের সহিত

কোন সম্পর্ক রাখিবে না, কেবলমাত্র দেশের কাজেই আত্মোৎসর্গ করিবে—সন্ন্যাসী হইবে। স্বামিজীর জ্বলন্ত উৎসাহে অনুপ্রাণিত হইয়া কয়েকজন শিক্ষিত যুবক সন্ন্যাসী হইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। এই সমস্ত চরিত্রবান্ সন্ন্যাসী যুবকগণ আসিয়া যখন বিবেকানন্দকে প্রণাম করিলেন, তখন স্বামিজী আনন্দের সহিত তাঁহাদিগকে আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, "বৎসগণ! তোমরা মানব জীবনের শ্রেষ্ঠতম ব্রত গ্রহণে উৎসাহিত হইয়াছ, ধন্য তোমাদের জন্ম, ধন্য তোমাদের বংশ—ধন্য তোমাদের গর্ভধারিণী জননী। কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা।" তারপর তিনি সেই তরুণ সন্ন্যাসীদের লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "দেখ, সন্ন্যাসীর কাজ দরিদ্র দুঃখী পতিত সকলকে যথাশক্তি সেবা করা—সাহায্য করা। সমস্ত মানবজাতির কল্যাণে নিজের সুখ বলি দেওয়া সন্ন্যাসীর কর্তব্য। যারা সন্ন্যাসী হয় অথচ দশজনের মঙ্গলের জন্য কাজ করে না তাদের জীবন বৃথা। তোমাদের পরের জন্য প্রাণ দিতে হবে, বিধবা পুত্র-হীনার চোখের জল মুছাতে হবে, নিরক্ষর গরীবেরা যাতে দু'পয়সা রোজগার ক'রে মোটা ভাত মোটা কাপড়ের সংস্থান করতে পারে তার উপায় দেখতে হবে, কেউ যদি অন্যায় ভাবে কারও উপর অত্যাচার

করে তা'হলে তার প্রতিবিধান করতে হবে, সকলকে ধর্মোপদেশ দিতে হবে—এইতো সন্ন্যাসীর কাজ। তোমরা সকলে জাগ্রত হও—দেশের সকলকে জাগ্রত কর, তোমাদের মানবজন্ম সফল হোক—ধন্য হোক।"

এইরূপে দেশের ও দশের সেবা করিবার জন্য বিবেকানন্দ "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মিশন" প্রতিষ্ঠা করিলেন। দরিদ্রনারায়ণের সেবাই এই মিশনের উদ্দেশ্য।

ক্রমাগত কয়েক বৎসরের পরিশ্রমে স্বামিজীর শরীর অত্যন্ত খারাপ হওয়ায় তিনি বিশ্রাম করিবার জন্য হিমালয় পর্বতের আলমোড়ায় গমন করিলেন। ঐ সময় মুর্শিদাবাদ জেলায় ভয়ানক দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হইল। ঐ সংবাদ শুনিয়া স্বামিজী আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, তখনই তিন জন সন্ন্যাসীকে তথায় পাঠাইলেন এবং নিজেও যাইতে প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু তাঁহার শরীর ভাল নয় বলিয়া ভক্তগণ তাঁহাকে তথায় যাইতে দিলেন না। আড়াই মাস কাল আলমোড়ায় থাকিয়া স্বামিজী পুনরায় দ্বিগুণ উৎসাহে পাঞ্জাব ও কাশ্মীরে ধর্ম-প্রচার করিতে লাগিলেন। তারপর রাজপুতানায় ধর্মপ্রচার করিয়া ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন এবং

কলিকাতার কিছুদূরে গঙ্গার পশ্চিম তীরে সন্ন্যাসীদের জন্য "বেলুড় মঠ" প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং নিজে বেলুড় মঠে থাকিয়া তরুণ সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীদের বেদান্ত, গীতা ইত্যাদি শাস্ত্র পড়াইতে লাগিলেন। অতিরিক্ত পরিশ্রমে পুনরায় স্বামিজীর স্বাস্থ্য ভাঙিয়া পড়িল। তাঁহার শিষ্যগণ ডাক্তারের পরামর্শে তাঁহাকে দার্জিলিং লইয়া গেলেন। ইতি-মধ্যে কলিকাতায় ভয়ানক প্লেগ আরম্ভ হইল। প্রত্যহ শত শত ব্যক্তি এই ভীষণ রোগে আক্রান্ত হইয়া প্রাণ বিসর্জন করিতে লাগিল। এই সংবাদ শুনিয়া কি করুণাকাতর-হৃদয় বিবেকানন্দ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারেন? তিনি তৎক্ষণাৎ কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন এবং ভগিনী নিবেদিতা ও আরও কয়েকটি শিষ্য সহকারে রোগীর সেবা আরম্ভ করিয়া দিলেন। কিন্তু এই কার্যে প্রচুর টাকার প্রয়োজন হইল। স্বামিজীর একজন গুরু-ভাই জিজ্ঞাসা করিলেন, "স্বামিজী, টাকা কোথায় পাওয়া যাইবে?" স্বামিজী তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন, "কেন, যদি টাকার দরকার হয়, তাহা হইলে বেলুড় মঠের জমি বিক্রয় করিব। সহস্র সহস্র ব্যক্তি আমাদের চোখের সম্মুখে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিবে, আর আমরা মঠে বাস করিব? আমরা সন্ন্যাসী, না হয়

পূর্বের মত গাছতলায় থাকিব আর ভিক্ষা করিয়া খাইব।”

বিবেকানন্দ বেলুড় মঠ বিক্রয় করিতে উদ্যত হইয়াছেন, এই সংবাদ শুনিয়া হৃদয়বান্ দেশবাসীরা প্রচুর অর্থ সাহায্য করিতে লাগিলেন, কাজেই আর মঠ বিক্রয় করিতে হইল না। কলিকাতায় একটি বড় জমি ভাড়া লইয়া বিবেকানন্দ কতকগুলি কুটীর নির্মাণ করিলেন। সেই সব কুটীরে সকল জাতির প্লেগ রোগীদিগকে আনিয়া কর্মিগণ সেবা করিতে লাগিলেন। স্বামিজী স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। স্বামিজী তাঁহার শিষ্যগণকে বলিলেন, “দেখলি, তোরা যে কেবল টাকার ভাবনা করিস? ওরে সৎকাজে কোনদিন টাকার অভাব হয় না। যদি তোরা নিঃস্বার্থভাবে দেশের সেবায় লেগে যাস্, তা’ হলে দেশের লোক আনন্দের সঙ্গে তোদের টাকা দেবে।”

স্বামিজী কাহাকেও ঘৃণা করিতেন না। যে মুচি মেথর হাড়ী ডোমকে অনেকে ঘৃণায় স্পর্শ করেন না, স্বামিজী তাহাদের ভাই বলিয়া আলিঙ্গন করিতেন। এমনিতর, দেশের লেখাপড়াজানা ভদ্র-লোকেরা যাদের ছোটলোক মূর্খ বলিয়া ঘৃণা করেন, স্বামিজী তাদের পক্ষ হইয়া তাদের দুঃখ দূর

করিবার জন্য জীবনপাত করিয়াছেন। দেশের গরীব দুঃখী, মূর্খের জন্য তিনি সর্বদা ব্যাকুল থাকিতেন। শিক্ষিত, উদারহৃদয় চরিত্রবান্ যুবকদের তিনি সর্বদাই বলিতেন যে, "দেখছিস্ না পূর্বাকাশে অরুণোদয় হয়েছে, সূর্য উঠবার আর বিলম্ব নেই। তোরা এই সময় কোমর বেঁধে লেগে যা। সংসার ফংসার করে কি হবে? তোদের এখন কাজ হচ্ছে, দেশে দেশে গাঁয়ে গাঁয়ে গিয়ে দেশের লোকদের বুঝিয়ে দেওয়া যে, আর আলিস্যি করে বসে থাকলে চলছে না। শিক্ষাহীন, ধর্মহীন বর্তমান অবনতির কথা তাদের বুঝিয়ে দিয়ে বলগে, 'ভাই সব উঠ, জাগো, কতদিন আর ঘুমুবে?' আর শাস্ত্রের মহান্ সত্যগুলি সরল করে তাদের বুঝিয়ে দেগে। এতদিন এদেশের ব্রাহ্মণেরা ধর্মটা একচেটে করে বসেছিল। কালের স্রোতে তা যখন আর টিক্‌লো না, তখন সেই ধর্মটা যাতে দেশের সকল লোকে পায় তার ব্যবস্থা করগে। সকলকে বোঝাগে ব্রাহ্মণের ন্যায় তোমাদেরও সমানাধিকার। আচণ্ডালকে এই অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত কর্। আর সোজা কথায় তাদের কৃষি-ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি গার্হস্থ্য জীবনের অতি-আবশ্যক বিষয়গুলি উপদেশ দেগে। নতুবা তোদের লেখাপড়াকে ধিক্, আর বেদ-বেদান্ত পড়াকেও ধিক্। লেগে যা—কয়-

দিনের জন্য জীবন? জগতে যখন এসেছিস্ তখন একটা দাগ রেখে যা। নতুবা গাছ পাথর তো হচ্ছে মরছে, ঐরূপ জন্মাতে মরতে মানুষের ইচ্ছা হয় কি? আমায় কাজে দেখা যে, তোদের বেদান্ত পড়া সার্থক হয়েছে। সকলকেই এইকথা শোনাগে—'তোমাদের মধ্যে অনন্তশক্তি রয়েছে। সেই শক্তি জাগিয়ে তোল।' নিজের মুক্তি নিয়ে কি হবে?—মুক্তিকামনাও তো মহা স্বার্থপরতা। ফেলে দে ধ্যান, ফেলে দে মুক্তি ফুক্তি—আমি যে কাজে লেগেছি সেই কাজে লেগে যা। তোরা ঐরূপে আগে জমি তৈরী করগে। আমার মত হাজার হাজার বিবেকানন্দ পরে বক্তৃতা করতে নরলোকে শরীর ধারণ করবে, তার জন্যে ভাব্না নেই। এই দেখ্না, যারা আগে ভাবতো আমাদের কোন শক্তি নেই—তারাই এখন সেবাশ্রম, অনাথাশ্রম, দুর্ভিক্ষ ফণ্ড কত কি খুলেছে, দেখছিস্ না— নিবেদিতা ইংরেজের মেয়ে হয়েও তোদের সেবা কর্তে শিখেছে? আর তোরা নিজের দেশের লোকের জন্য তা' করতে পারবিনি? যেখানে মহা-মারী হয়েছে, যেখানে জীবের দুঃখ হয়েছে, যেখানে দুর্ভিক্ষ হয়েছে—চলে যা সেইদিকে। নয় মরেই যাবি। তোর আমার মত কত কীট হচ্ছে-মরছে, তাতে জগতের কি আস্ছে যাচ্ছে? একটা মহান্ উদ্দেশ্য

নিয়ে মরে যা। মরে তো যাবিই, তা' ভাল উদ্দেশ্য নিয়ে মরা ভাল। এই ভাব ঘরে ঘরে প্রচার কর, নিজের ও দেশের মঙ্গল হবে। তোরাই দেশের আশা-ভরসা, তোদের কর্মহীন দেখ্‌লে আমার বড় কষ্ট হয়। লেগে যা—লেগে যা। দেরী করিস্‌নি—মৃত্যু তো দিন দিন নিকটে আস্‌ছে। আর পরে কর্‌বি বলে বসে থাকিস্‌ নি—তা'হলে কিছু হবে না।"

দেশের জনসাধারণের কিসে ভাল হইবে এই চিন্তায় স্বামিজীর বিন্দুমাত্র অবসর ছিল না। সর্বদাই সেই কথাই বলিতেন, সেই বিষয়েই আলোচনা করিতেন। একদিন "হিতবাদী" সম্পাদক প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক পণ্ডিত সখারাম গণেশ দেউস্কর মহাশয় একজন বন্ধুসহ স্বামিজীকে দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। স্বামিজী অনেকক্ষণ তাঁহাদের সহিত দেশের বর্তমান দুরবস্থার বিষয় আলোচনা করিলেন। বিদায়ের সময় পণ্ডিতজীর বন্ধু দুঃখ করিয়া বলিলেন, "স্বামিজী, আপনার নিকট ধর্মকথা শুনিবার জন্য আমরা আগ্রহ করিয়া আসিয়াছিলাম, কিন্তু অতি সাধারণ বিষয়ের আলোচনা হইল। আজকার সাধুদর্শন বিফল হইল।" স্বামিজীর উজ্জ্বল মুখখানি গম্ভীর হইল। তিনি ধীরভাবে বলিলেন, "মহাশয়, যে পর্যন্ত আমার জন্মভূমির

একটি কুকুর পর্যন্ত অভুক্ত থাকিবে, ততদিন পর্যন্ত তাহাকে আহার দেওয়াই আমার ধর্ম। ইহা ছাড়িয়া আর যা কিছু অধর্ম।" পণ্ডিত দেউস্কর্জী বলিতেন যে, স্বামিজীর ঐ কয়টি কথা চিরদিন তাঁহার মনে ছিল এবং সেইদিন তিনি বুঝিয়াছিলেন যে প্রকৃত স্বদেশপ্রেম কাহাকে বলে।

বিবেকানন্দকে দেখিবার জন্য বেলুড় মঠে প্রত্যহ নানা শ্রেণীর লোক আসিতেন। কিন্তু কলেজের ছাত্র ও শিক্ষিত যুবকদের সঙ্গে ধর্ম দর্শন, সাহিত্য ইতিহাস, বিজ্ঞান ইত্যাদির আলোচনায় তিনি বেশী উৎসাহ প্রকাশ করিতেন। বাঙলার শিক্ষিত হৃদয়বান্ যুবকেরা বিবেকানন্দের মুখে প্রথম জাতির জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের কথা শুনিল, "আগামী পঞ্চাশ বৎসর, একমাত্র জননী জন্মভূমিই তোমাদের একমাত্র উপাস্য ইষ্টদেবতা, অন্যান্য অকেজো দেবতাদের এই কয় বর্ষ ভুলিলেও কোন ক্ষতি নাই। অন্যান্য দেবতা নিদ্রিত। একমাত্র দেবতা তোমার স্বজাতি; সর্বত্রই তাঁহার হস্ত, সর্বত্রই তাঁহার কর্ণ, তিনি সকল দেশ ব্যাপিয়া আছেন। তোমরা কোন নিষ্কর্মা দেবতার অন্বেষণে ধাবিত হইতেছ? তোমার সম্মুখে তোমার চতুর্দিকে যে দেবতাকে দেখিতেছ, সেই বিরাটের উপাসনা করিতে পারিতেছ



ভগিনী নিবেদিতা

না? * * * এই সব মানুষ, এই সব পশু, ইহারাই তোমার ঈশ্বর, আর তোমার স্বদেশবাসীরাই তোমার প্রথম উপাস্য।"

এই কালে কথাবার্তায় তিনি প্রায়ই বলিতেন, "I want to preach a man-making religion—আমি এমন এক ধর্ম প্রচার করিতে চাই যাহাতে মানুষ তৈয়ারী হয়।" একদিন এক শিষ্য তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন, "স্বামিজী! আপনি অসাধারণ বাগ্মিতাবলে ইয়োরোপ আমেরিকা মাতাইয়া আসিয়া নিজ জন্মভূমিতে চুপ করিয়া আছেন, ইহার কারণ কি?"

আচার্যদেব শিষ্যদের লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "এ দেশে আগে জমি তৈরী করতে হবে। অন্নাভাবে ক্ষীণদেহ ক্ষীণমন রোগশোকপরিতাপভরা ভারতে লেকচার ফেকচার দিয়ে কি হবে? প্রথমতঃ কতকগুলি ত্যাগী পুরুষের প্রয়োজন—যারা নিজেদের সংসারের জন্য না ভেবে পরের জন্য জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হবে। * *"

অবিরত ভ্রমণ ও কঠোর পরিশ্রমে স্বামিজীর শরীর ভাঙিয়া পড়িতেছিল, কিন্তু সেদিকে তাঁহার লক্ষ্য ছিল না। এমন সময় আমেরিকা হইতে তাঁহার শিষ্য ও ভক্তগণ আহ্বান করিতে লাগিলেন।

ভারতীয় শিষ্যরাও ভাবিলেন, সমুদ্রযাত্রায় স্বামিজীর স্বাস্থ্যের উন্নতি হইবে, অতএব তাঁহারা আপত্তি করিলেন না। ১৮৯৯ সালের ২০শে জুন স্বামিজী বাগবাজার মঠে শ্রীরামকৃষ্ণভক্ত জননী শ্রীশ্রীমার পদ-ধূলি লইয়া গুরুভ্রাতা স্বামী তুরীয়ানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতা সহ পুনরায় আমেরিকা যাত্রা করিলেন।

মানবমিত্র বিবেকানন্দ

কলিকাতা হইতে জাহাজ ছাড়িল। রামকৃষ্ণ মিশনের মুখপত্র মাসিক পত্রিকা 'উদ্বোধন'এর সম্পাদক স্বামিজীকে উদ্বোধনে নিয়মিত লিখিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। জাহাজে বসিয়া স্বামিজী 'বর্তমান ভারত' এবং এবারের ভ্রমণ-কাহিনী 'পরিব্রাজক' লেখা শেষ করেন। 'পরিব্রাজক' রোজনামচার মত করিয়া লেখা। স্বামিজী বাঙলা দেশকে কত ভালবাসিতেন তাহার পরিচয়স্বরূপ কিছুটা উদ্ধৃত করিতেছি। ইহা স্বামিজীর চলতি ভাষায় মৌলিক রচনা।

"আপনার লোকের একটা রূপ থাকে, তেমন আর কোথাও দেখা যায় না। নিজের খ্যাঁদা বোঁচা ভাইবোন ছেলেমেয়ের চেয়ে গন্ধর্বলোকেও সুন্দর পাওয়া যাবে না সত্য; কিন্তু গন্ধর্বলোক বেড়িয়েও যদি আপনার লোককে যথার্থ সুন্দর পাওয়া যায়, সে আহ্লাদ রাখবার কি আর জায়গা থাকে? এই অনন্তশস্যশ্যামলা সহস্রস্রোতস্বতিমাল্যধারিণী বাঙলাদেশের একটি রূপ আছে। সে রূপ—কিছু

আছে মালায়ালামে (মালাবার), আর কিছু কাশ্মীরে। জলে কি আর রূপ নাই! জলে জলময়, মুষলধারে বৃষ্টি কচুর পাতার উপর দিয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে, রাশি রাশি তাল নারিকেল খেজুরের মাথা একটু অবনত হয়ে সে ধারাসম্পাত বইচে, চারিদিকে ভেকের ঘর্ঘর আওয়াজ,—এতে কি রূপ নাই? আর আমাদের গঙ্গার কিনার, বিদেশ থেকে না এলে, ডায়মণ্ডহারবারের মুখ দিয়ে গঙ্গায় না প্রবেশ করলে, সে বোঝা যায় না। সে নীল নীল আকাশ, তার কোলে কাল মেঘ, তার কোলে সাদাটে মেঘ, সোনালি কিনারাদার, তার নীচে ঝোপ ঝোপ তাল নারিকেল খেজুরের মাথা বাতাসে যেন লক্ষ লক্ষ চামরের মত হেল্‌চে, তার নীচে ফিকে ঘন ঈষৎ পীতাভ একটু কাল মেশান, ইত্যাদি হরেক রকম সবুজের কাঁড়িঢালা আম লিচু জাম কাঁঠাল,—পাতাই পাতা—গাছ ডালপালা আর দেখা যাচ্ছে না। আশে পাশে ঝাড় ঝাড় বাঁশ হেলছে দুলছে, আর সকলের নীচে—যার কাছে ইয়ারকান্দী ইরাণী তুর্কীস্থানী গালচে-দুলচে কোথায় হার মেনে যায়,—সেই ঘাস, যতদূর চাও সেই শ্যাম শ্যাম ঘাস, কে যেন ছেঁটে-ছুটে ঠিক করে রেখেছে; জলের কিনারা পর্যন্ত সেই ঘাস; গঙ্গার মৃদুমন্দ হিল্লোল যে অবধি

জমিকে ঢেকেছে, যে অবধি অল্প অল্প লীলাময় ধাক্কা দিচ্ছে, সে অবধি ঘাসে আঁটা। আবার তার নীচে আমাদের গঙ্গাজল। আবার পায়ের নীচ থেকে দেখ, ক্রমে উপরে যাও, উপর উপর মাথার উপর পর্যন্ত, একটি রেখার মধ্যে এত রঙের খেলা, একটি রঙে এত রকমারী আর কোথাও দেখেছো? বলি, রঙের নেশা ধরেছে কখনও কি—যে রঙের নেশায় পতঙ্গ আগুনে পুড়ে মরে, মৌমাছি ফুলের গারদে অনাহারে মরে? হুঁ, বলি এই বেলা এ গঙ্গা মার শোভা যা দেখবার দেখে নাও। আর বড় একটা কিছু থাকছে না, দৈত্য-দানবের হাতে পড়ে এ সব যাবে।”

এই সমুদ্রযাত্রার প্রসঙ্গে ভগিনী নিবেদিতা লিখিয়াছেন, “এই সমুদ্রযাত্রার প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত নানাবিধ ভাব ও গল্পের অবিরাম স্রোত চলিয়াছিল। কেহ জানিত না, কোন মুহূর্তে স্বামিজীর উপলব্ধির দ্বার উন্মুক্ত হইবে এবং জ্বলন্ত ভাষায় নূতন নূতন সত্যের বার্তা আমরা শুনিতে পাইব। সমুদ্রযাত্রার প্রারম্ভে প্রথমদিন অপরাহ্ণে আমরা ভাগীরথীবক্ষে জাহাজে বসিয়া গল্প করিতেছি, এমন সময় স্বামিজী সহসা বলিয়া উঠিলেন, ‘দেখ, যতই দিন যাইতেছে, ততই আমি স্পষ্ট উপলব্ধি করিতেছি, মনুষ্যত্ব লাভই জীবনের

শ্রেষ্ঠ সাধনা, এই অভিনব বার্তাই আমি জগতে প্রচার করিতেছি। যদি অন্যায় কাজ করিতে হয় তবে তাহাও মানুষের মত কর। যদি দুষ্টই হইতে হয়, তবে বড় রকমের একটা দুষ্ট হও'।"

৩১শে জুলাই স্বামিজী লণ্ডনে পৌঁছিলেন। কয়েকদিন ভক্ত ও শিষ্যদের সহিত যাপন করিয়া ১৬ই আগষ্ট তিনি স্বামী তুরীয়ানন্দ ও দুইজন আমেরিকান শিষ্যসহ নিউইয়র্ক যাত্রা করিলেন।

স্বামিজী নিউইয়র্কে উপস্থিত হইলে স্বামিজীর মাতৃস্বরূপা মিসেস্ লিগেট তাঁহাকে স্বালয়ে লইয়া গেলেন। স্বামিজীর শরীর অসুস্থ বলিয়া ইনি তাঁহাকে বক্তৃতা করিতে দিলেন না। সহর হইতে দূরে নিজের এক পল্লীভবনে লইয়া গেলেন। ইঁহার স্বামী মিঃ লিগেটও স্বামিজীকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। এই বিদেশীয় বিধর্মী ধনী পরিবার স্বামিজীকে যে এত ভালবাসিতেন তাহার কারণ—বিবেকানন্দের ত্যাগপূত চরিত্র। স্বামিজীর ভ্রমণ এবং বেদান্ত প্রচারের জন্য লিগেট দম্পতি প্রচুর অর্থ অকাতরে ব্যয় করিয়াছেন।

কিছুদিন পর স্বামিজী নিউইয়র্কে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার পূর্ব শিষ্য, ছাত্র ও বন্ধুগণ তাঁহাকে দলে দলে দেখিতে আসিতে লাগিল।

যাঁহারা পূর্বে বিবেকানন্দের বই পড়িয়াছেন, অথচ তাঁহাকে দেখেন নাই, তাঁহারাও তাঁহার শ্রীমুখ হইতে দুটো একটা উপদেশ শুনিবার জন্য নানাস্থান হইতে ছুটিয়া আসিতে লাগিলেন। স্বামিজী নিউ-ইয়র্ক, শিকাগো প্রভৃতি কয়েকটি নগর পরিভ্রমণ করিয়া অবশেষে কালিফোর্নিয়ায় গিয়া প্রচারকার্যে রত হইলেন। স্বামিজীর চেষ্টায় যুক্তরাজ্যের স্থানে স্থানে 'বেদান্ত সমিতি' স্থাপিত হইল। স্বামিজী এইরূপে কয়েকমাস প্রচারকার্যে ব্যাপৃত থাকিয়া অবশেষে পুনরায় নিউইয়র্কে ফিরিয়া আসিলেন।

এদিকে তখন ফরাসী দেশের রাজধানী প্যারী নগরীতে একটি বিরাট মহামেলা বসাইবার আয়োজন চলিতেছিল। ঐ মহামেলায় যাইবার জন্য লিগেট দম্পতি স্বামিজীকে আহ্বান করিলেন। ঐ মহা-মেলার অঙ্গীয় ধর্মেতিহাস সভায় স্বামিজী সসম্মানে নিমন্ত্রিত হইলেন। ফরাসী দেশে গেলে ফরাসী ভাষা শিক্ষার প্রয়োজন বুঝিয়া স্বামিজী জাহাজে ফরাসী ভাষা শিখিতে লাগিলেন। আমেরিকা হইতে ফ্রান্সে আসিবার পথে জাহাজেই তিনি অল্পদিনের মধ্যে ঐ ভাষা শিখিয়া লইলেন এবং সভায় ফরাসী ভাষায় বক্তৃতা করিলেন। উক্ত সভায় জার্মেনী, ইংলণ্ড, ইতালী প্রভৃতি নানা দেশ

হইতে বহু বিখ্যাত পণ্ডিত যোগদান করিয়াছিলেন। সকলেই স্বামিজীর অদ্ভুত পাণ্ডিত্য দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন এবং মুক্ত কণ্ঠে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। পৃথিবীর অনেক বড় বড় বিখ্যাত জ্ঞানী গুণী তাঁহার অকৃত্রিম বন্ধু হইলেন। তিন মাস কাল প্যারী নগরীতে বাস করিয়া স্বামিজী কয়েকজন ধনী ও পণ্ডিত বন্ধুসহ ভ্রমণে বহির্গত হইলেন; বুলগেরিয়া, গ্রীস, তুরস্ক প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করিয়া মিশরের রাজধানী কায়রো নগরে উপস্থিত হইলেন। ইউরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ নগরীগুলি দেখিয়া স্বামিজী মনে মনে বড়ই অশান্তি অনুভব করিতেন। কেবল ঐশ্বর্য ও বিলাসের আড়ম্বর, কেবল নিজের নিজের স্বার্থসাধনের চেষ্টা দেখিয়া তাঁহার অন্তরে বড়ই ব্যথা লাগিত! অবশেষে একদিন সহসা মিশর হইতে কাহাকেও কিছু না বলিয়া তিনি ভারত অভিমুখে রওনা হইলেন। এবার স্বামিজী অভ্যর্থনাদি বিষয়ে সাবধান হইলেন। বোম্বাই হইতে কলিকাতা রওনা হওয়ার পথে কেহ যাহাতে তাঁহাকে চিনিতে না পারে, সেজন্য সন্ন্যাসীর গেরুয়া ছাড়িয়া সাহেবী পোষাক পরিলেন এবং মাথায় একটা প্রকাণ্ড টুপী দিলেন, কাজেই কেহই সাহেব মনে করিয়া তাঁহার নিকটে আসিল না। তিনি নীরবে হাওড়া ষ্টেশনে নামিয়া

একখানা গাড়ী করিয়া বেলুড় মঠে উপস্থিত হইলেন।

বিবেকানন্দ মহাপণ্ডিত, অদ্বিতীয় অলৌকিক শক্তিশালী বলিয়া তোমরা মনে করিও না যে, তিনি সব সময় গম্ভীর হইয়া থাকিতেন। তাঁহার স্বভাব বালকের মত সরল ছিল, সময় সময় বালকের মত ছেলেমি ও রহস্য করিয়া নিজের গুরুভাই ও বন্ধুদের সঙ্গে নানাপ্রকার আমোদ করিতেন। নিম্নলিখিত ঘটনা হইতে তাহা বুঝা যাইবে।

স্বামিজী যে বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন, এ সংবাদ কেহই জানিতেন না। মঠের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণ রাত্রে খাইতে বসিয়াছেন, এমন সময় বাগানের মালী আসিয়া খবর দিল, একজন সাহেব আসিয়াছেন, গেট খুলিবার জন্য চাবির প্রয়োজন। একজন সন্ন্যাসী আসিয়া গেট খুলিয়া দেখেন, গাড়ী খালি, তাহার মধ্যে কেহ নাই। এদিকে সাহেব টুপীটা মুখের উপর টানিয়া দিয়া খাওয়ার ঘরের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। স্বামী প্রেমানন্দজী দীপহস্তে দেখেন, সাহেব আর কেহ নহেন—তাঁহাদেরই প্রিয়তম শ্রীবিবেকানন্দ! স্বামিজী বালকের মত উচ্চহাস্য করিয়া বলিলেন, "বাইরে থেকে খাবার ঘণ্টা শুনে ভাবলুম যে, যদি তাড়াতাড়ি

না যাই তা'হলে রাত্রে খেতে পাব না, তাই পাঁচিল টপ্‌কে চলে এলুম। বড় খিদে পেয়েছে, আমায় খেতে দাও।" স্বামিজীর কথা শুনিয়া এবং বহুদিন পর তাঁহাকে পাইয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মঠের সন্ন্যাসীদের মধ্যে একটা আনন্দের সাড়া পড়িয়া গেল। স্বামিজী আগ্রহ ও আনন্দের সহিত বহুদিন পর খিচুড়ী খাইতে খাইতে নানাবিধ গল্প করিতে লাগিলেন।

ইতিপূর্বেই বিবেকানন্দ হিমালয়শিখরে মায়াবতীতে একটি মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। উক্ত মঠের অধ্যক্ষ মিঃ সেভিয়ার ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন, এই সংবাদ পাইয়াই তিনি তাড়াতাড়ি মিশর হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। বেলুড় মঠে পৌঁছিয়াই তিনি মিঃ সেভিয়ারের সহধর্মিণী মিসেস সেভিয়ারকে সান্ত্বনা দিবার জন্য এবং উক্ত মঠের সুবন্দোবস্ত করিবার জন্য মায়াবতী রওনা হইলেন। মঠে আসিয়া স্বামিজী তাঁহার উপযুক্ত শিষ্য স্বদেশপ্রেমিক স্বামী স্বরূপানন্দের হস্তে মঠের কার্যভার অর্পণ করিলেন। হিমালয়ের মনোহর বৈরাগ্যময় গম্ভীর শ্রী স্বামিজীর মনে এক অপূর্ব শান্তি আনিয়া দিল। তিনি অধিকাংশ সময়ই ধ্যানে জপে মগ্ন হইয়া থাকিতেন। নিজের শারীরিক অবস্থা দেখিয়া আর অধিকদিন তিনি

এভাবে কাজ করিতে পারিবেন না বুঝিয়াছিলেন এবং সেই জন্য শিষ্যদের ও গুরুভাইদের কাজ করিবার জন্য উৎসাহ দিতেন।

আলমোড়া হইতে কলিকাতায় ফিরিয়াই স্বামিজী পূর্ববঙ্গে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন এবং ১৯০১ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে ঢাকায় আসিলেন। স্থানীয় প্রসিদ্ধ জমিদার বাবু মোহিনীমোহন দাসের প্রাসাদতুল্য ভবনে বাস করিতে লাগিলেন। কয়েকদিন পর তিনি বুধাষ্টমী উপলক্ষ্যে ব্রহ্মপুত্র স্নানের জন্য সদলবলে লাঙ্গলবন্ধ যাত্রা করিলেন। তথায় পুণ্যস্নান শেষ করিয়া পুনরায় ঢাকায় ফিরিয়া আসিলেন। স্থানীয় ভদ্রমহোদয়গণ এবং ভক্তবৃন্দ কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া তিনি দুইটি বক্তৃতা প্রদান করিলেন। ঢাকা হইতে স্বামিজী সাধু নাগ-মহাশয়ের জন্মভূমি দেওভোগ গ্রাম দর্শনার্থ গমন করেন। তখন নাগমহাশয় আর ইহলোকে নাই। নাগমহাশয়ের ধর্মরতা সাধ্বী সহধর্মিণী পরমযত্নে ভক্তির সহিত স্বামিজীর সেবা করিলেন। বিবেকানন্দ তাঁহার আলয়ে অতিথি, এ সৌভাগ্য লাভ করিয়া উক্ত মহিয়সী মহিলা আনন্দে অধীর হইলেন—কি খাওয়াইবেন, কোথায় রাখিবেন ভাবিয়া পাইলেন না। স্বামিজী বিদায় লইবার সময় নাগমহাশয়ের সহ-

ধর্মিণী তাঁহাকে একখানি কাপড় দিলেন। যে বিবেকানন্দ রাজা মহারাজা প্রদত্ত বহুমূল্য উপহার কখনো গ্রহণ করেন নাই, লক্ষ লক্ষ টাকা যিনি ধূলি-মুষ্টির মত ত্যাগ করিয়াছেন, সেই বিবেকানন্দ এই বিধবার প্রদত্ত কাপড়খানি বহু মান সহকারে গ্রহণ করিলেন এবং আনন্দের ও শ্রদ্ধার সহিত উহা মাথায় জড়াইয়া ঢাকায় ফিরিয়া আসিলেন।

ঢাকা হইতে স্বামিজী প্রসিদ্ধ তীর্থ শ্রীশ্রীচন্দ্রনাথ যাত্রা করিলেন। তথা হইতে গোয়ালপাড়া হইয়া গৌহাটীতে আসিলেন এবং কামাখ্যা দেবী দর্শন করিলেন। ঢাকাতেই তাঁহার শরীর অসুস্থ হইয়াছিল; স্বাস্থ্যলাভ করিবার জন্য তিনি শিষ্যগণের আগ্রহে ও অনুরোধে শিলং পাহাড়ে গেলেন। কিন্তু সেখানেও তিনি পীড়িত হইয়া পড়িলেন। উত্তরোত্তর তাঁহার অবস্থা খারাপ হইতে লাগিল। একদিন রাত্রে এত শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হইল যে তাঁহার শিষ্যবৃন্দ প্রতি মুহূর্তে দেহত্যাগের আশঙ্কা করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি আপন মনেই বলিয়া উঠিলেন, "যদি আজ এখনই আমার মৃত্যু হয় তাহাতেই বা কি? আমি মানুষকে চিন্তা করিবার মত, কাজ করিবার মত অনেক জিনিষ দিয়াছি।"

ক্রমে রাত্রি গভীর হইল—রোগের যন্ত্রণা আরও বেশী হইল। একজন তরুণ ব্রহ্মচারী রাত্রি জাগিয়া স্বামিজীর সেবা করিতে লাগিলেন। এই যুবক স্বামিজীর প্রতি অশেষ ভক্তিমান্ ছিলেন, মহা-পুরুষের এত কষ্ট দেখিয়া তাঁহার চক্ষে জল আসিল। তিনি বারবার কাতরভাবে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, "হে ভগবান্, দয়া করিয়া এই রোগ ও কষ্ট আমাকে দাও, স্বামিজী সুস্থ হউন।" যুবক আপন মনে এই কথা ভাবিতেছেন, এমন সময় বিবেকানন্দ তাঁহার দিকে করুণা-কাতর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "বৎস! আমি যে সংসারে দুঃখ কষ্ট ভোগ করিবার জন্যই জন্মিয়াছি, তুমি অধীর হইও না!" যাহা হউক, ব্রহ্মচারীর কাতর প্রার্থনা ভগবান শুনিলেন, স্বামিজী অপেক্ষা-কৃত সুস্থ হইয়া উঠিলেন।

শিলং হইতে বেলুড় মঠে ফিরিয়া আসিবার পর স্বামিজীর শরীরের অবস্থা দেখিয়া শিষ্যবৃন্দ ও মঠের অন্যান্য সন্ন্যাসিগণ অতীব চিন্তিত হইলেন। অবশেষে সকলে মিলিয়া স্বামিজীকে কিছুদিনের জন্য প্রচারকার্য বন্ধ করিবার অনুরোধ করিলেন। কবিরাজী ঔষধ সেবনে কিছু কিছু উপকার হইতে লাগিল বটে, কিন্তু চিকিৎসকের

কঠোর নিয়ম প্রতিপালন করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইল। তাঁহার বেশী কথাবার্তা বলিতে নিষেধ ছিল। কিন্তু যে কেহ স্বামিজীর সহিত দেখা করিতে আসিতেন, স্বামিজী নিজের রোগের কথা ভুলিয়া তাঁহাদিগের সহিত ধর্মালাপ করিতেন। যদি কলেজের যুবক ছাত্রগণ তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিত, তাহা হইলে স্বামিজী আবেগের সহিত উদ্দীপনাপূর্ণ ভাষায় তাহাদের নিকট সেবা-ধর্মের মহিমা কীর্তন করিতেন এবং সকলকেই দরিদ্রনারায়ণ সেবায় অগ্রসর হইবার জন্য উৎসাহ প্রদান করিতেন। স্বদেশবাসীর দুঃখ কষ্টের কথা আরম্ভ হইলে তাঁহার জ্ঞান থাকিত না। অনেক সময় স্বামিজীর গুরুভাইগণ তাঁহাকে বাক্যালাপ বন্ধ করিবার কথা ও তাঁহার অসুখের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেন। স্বামিজী উত্তর দিতেন, "রেখে দে তোর নিয়ম ফিয়ম। এদের মধ্যে যদি একজনও ঠিক ঠিক আদর্শ জীবন যাপন করতে প্রস্তুত হয়, তা'হলে আমার শ্রম সার্থক। পর-কল্যাণে হলই বা দেহপাত, তাতে কি আসে যায়? চুপ করে ঘরের দোর বন্ধ করে বেঁচে থেকেই বা ফল কি? এরা কত দূর থেকে কত কষ্ট করে আমার দুটো কথা শুনবার জন্য এসেছে, আর অমনি অমনি ফিরে যাবে? তোরা

যা' পারিস কর, আমি জড়ের মত চুপ করে বসে থাক্‌তে পারব না।"

এই সময় যাঁহারা স্বামিজীর নিকট যাইতেন, তাঁহাদের প্রত্যেকেই এখনো কৃতজ্ঞচিত্তে স্বামিজীর অপার দয়া, অসীম স্নেহ, সর্বোপরি তাঁর গভীর স্বদেশ ও স্বজাতি-প্রীতির কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া থাকেন। ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই বলেন, "কত বড় বড় পণ্ডিত, বক্তা, সাধুসন্ন্যাসী দেখিলাম, কিন্তু বিবেকানন্দের ন্যায় সহৃদয়, ব্যথার ব্যথী, দরিদ্র পতিত কাঙগালের বন্ধু একজনও দেখিলাম না।"

তোমরা মনে করিও না যে স্বামিজী কেবল উপদেশই দিতেন, তিনিও নিজের হাতে দরিদ্রের সেবা করিতে পারিলে অতীব আনন্দিত হইতেন। এইরূপ একটি ঘটনা পূজনীয় শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় তাঁহার "স্বামী-শিষ্য সংবাদ" নামক পুস্তকে লিখিয়াছেনঃ—

মঠের জমি সাফ করিতে প্রতি বর্ষেই কতকগুলি স্ত্রী-পুরুষ সাঁওতাল আসিত। স্বামিজী তাহাদের লইয়া কত রঙ্গ করিতেন এবং তাহাদের সুখ দুঃখের কথা শুনিতে কত ভালবাসিতেন। * * সাঁওতালদের মধ্যে একজনের নাম ছিল কেষ্টা।

স্বামিজী কেষ্টাকে বড়ই ভালবাসিতেন। কথা কহিতে আসিলে কেষ্টা কখনো কখনো স্বামিজীকে বলিত, "ওরে স্বামী বাপ্, তুই আমাদের কাজের বেলায় এখান্‌কে আসিস্ না—তোর সঙ্গে কথা বললে আমাদের কাজ বন্ধ হয়ে যায়; আর বুড়ো-বাবা এসে বকে।" কথা শুনিয়া স্বামিজীর দুচোখ ছল ছল করিত এবং তিনি বলিতেন, "না না বুড়োবাবা বক্‌বে না, তুই তোদের দেশের দুটো কথা বল"—বলিয়া তাহাদের সাংসারিক দুঃখ কষ্টের কথা পাড়িতেন।

একদিন স্বামিজী কেষ্টাকে কহিলেন—"ওরে তোরা আমাদের এখানে খাবি?" কেষ্টা বলিল, "আমরা যে তোদের ছোঁয়া এখন খাই না, এখন যে বিয়ে হয়েছে, তোদের ছোঁয়া নুন খেলে যে জাত যাবে রে বাপ্।" স্বামিজী বলিলেন, "নুন কেন খাবি? নুন না দিয়ে তরকারী রেঁধে দেবে, তা' হলে তো খাবি?" কেষ্টা ঐ কথায় স্বীকৃত হইল। অনন্তর স্বামিজীর আদেশে মঠে ঐ সকল সাঁওতাল-দের জন্য লুচি, তরকারী, মিঠাই, মণ্ডা, দধি ইত্যাদির জোগাড় করা হইল এবং তিনি তাহাদিগকে বসাইয়া খাওয়াইতে লাগিলেন। খাইতে খাইতে কেষ্টা বলিল,—"হাঁরে স্বামী বাপ্—তোরা এমন

জিনিষটা কোথায় পেলি—হামরা এমনটা কখনো খাইনি।” স্বামিজী তাহাদের পরিতোষ করিয়া খাওয়াইয়া বলিলেন—“তোরা যে নারায়ণ, আজ আমার নারায়ণের ভোগ দেওয়া হ'লো।” স্বামিজী যে নর-নারায়ণ সেবার কথা বলিতেন, তাহা তিনি নিজে এইরূপে অনুষ্ঠান করিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন।

আহারান্তে সাঁওতালেরা বিশ্রাম করিতে গেলে স্বামিজী শিষ্যকে বলিলেন—“এদের দেখলুম যেন সাক্ষাৎ নারায়ণ—এমন সরলচিত্ত, এমন অকপট অকৃত্রিম ভালবাসা, এমন আর দেখিনি।” অনন্তর মঠের সন্ন্যাসীবর্গকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, “দেখ্ এরা কেমন সরল! এদের কিছু দুঃখ দূর করতে পার্‌বি? নতুবা গেরুয়া পরে আর কি হল? পরহিতায় সর্বস্ব অর্পণ—এরই নাম যথার্থ সন্ন্যাস। এদের ভাল জিনিষ কখনো কিছু ভোগ হয় নি! ইচ্ছা হয়, মঠ ফঠ সব বিক্রী করে, দেই এই সব গরীব দুঃখী দরিদ্রনারায়ণদের বিলিয়ে। আমরা তো গাছতলা সার করেইছি। আহা, দেশের লোক খেতে পরতে পাচ্ছে না—আমরা কোন্ প্রাণে মুখে অন্ন তুলছি? * * * দেশের লোক দুবেলা দুমুঠো খেতে পায় না দেখে এক এক সময় মনে হয়, ফেলে দেই তোর শাঁখ-বাজান, ঘণ্টানাড়া, ফেলে দেই তোর

লেখাপড়া, নিজে মুক্ত হবার চেষ্টা—সকলে মিলে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে চরিত্র ও সাধনাবলে বড়লোকদের বুঝিয়ে কড়িপাতি জোগাড় করে নিয়ে আসি ও দরিদ্রনারায়ণদের সেবা করে জীবনটা কাটিয়ে দেই।

"আহা, দেশের গরীব দুঃখীর জন্য কেউ ভাবে না রে! যারা জাতির মেরুদণ্ড, যাদের পরিশ্রমে অন্ন জন্মাচ্ছে—যে মেথর মুদ্দফরাস কাজ বন্ধ করলে একদিনে সহরে হাহাকার উঠে যায়, তাদের সহানুভূতি করে, তাদের সুখে দুঃখে সান্ত্বনা দেয়, দেশে এমন কেউ নাই রে! এই দেখ না—হিন্দুদের সহানুভূতি না পেয়ে মান্দ্রাজ অঞ্চলে হাজার হাজার পারিয়া (চণ্ডালজাতি) কৃশ্চিয়ান হয়ে যাচ্ছে। মনে করিস্‌নি, কেবল পেটের দায়ে কৃশ্চিয়ান হয়, আমাদের সহানুভূতি পায় না বলে। আমরা দিনরাত তাদের বলছি—'ছুঁস্‌নে ছুঁস্‌নে।' দেশে কি আর দয়াধর্ম আছে রে বাপ্‌? কেবল ছুঁৎমার্গীর দল! অমন আচারের মুখে মার ঝাঁটা, মার লাথি! ইচ্ছা হয়—তোর ছুঁৎমার্গের গণ্ডি ভেঙে ফেলে এখনি যাই—'কে কোথায় পতিত কাঙ্গাল দীন-দরিদ্র আছিস্‌' বলে তাদের ঠাকুরের নামে ডেকে নিয়ে আসি। এরা না উঠলে মা (জন্মভূমি স্বদেশ)

জাগবেন না। আমরা এদের অন্নবস্ত্রের সুবিধা করতে পারলুম না, তবে আর কি হ'ল? হায়! এরা দুনিয়াদারীর (সরলপ্রকৃতি বলে) কিছু জানে না, তাই দিনরাত খেটেও অশন-বসনের সংস্থান করতে পারছে না। দে, সকলে মিলে এদের চোখ খুলে দে—আমি দিব্য চক্ষে দেখছি, এদের ও আমার ভিতর একই ব্রহ্ম, একই শক্তি রয়েছেন; কেবল বিকাশের তারতম্য মাত্র। সর্বাঙ্গে রক্ত-সঞ্চার না হ'লে কোন দেশ কোন কালে কোথাও উঠেছে দেখেছিস্? একটা অঙ্গ পড়ে গেলে আর অঙ্গ সবল থাকলেও ঐ দেহ দিয়ে কোন বড় কাজ আর হবে না—এ নিশ্চয় জানবি।"

স্বামিজী অনেকটা সুস্থ হইয়া দুইজন জাপানী বন্ধুর সঙ্গে বুদ্ধগয়ায় গেলেন। যেখানে ভগবান্ বুদ্ধদেব তপস্যা করিয়াছিলেন, সেই পুরাতন পবিত্র বটবৃক্ষের মূলে স্বামিজী কয়েক-দিন ধ্যান তপস্যা করিয়া পবিত্র তীর্থ শ্রীশ্রীকাশী-ধামে গমন করিলেন; সেখানে স্বামিজীর কয়েকটি যুবক শিষ্য তাঁহার উপদেশে একত্রিত হইয়া রোগী আর অনাথের সেবা আরম্ভ করিয়াছিলেন। স্বামিজী আনন্দের সহিত তাহাদিগকে উৎসাহ দিতে লাগিলেন। কিছুদিন পর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

পরমহংসদেবের জন্মোৎসব নিকটবর্তী বলিয়া বেলুড় মঠে ফিরিয়া আসিলেন।

মঠে আসিয়া স্বামিজী মঠের নবীন সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীদের শিক্ষা দিতে লাগিলেন। স্বামিজী সর্বদা এত কাজে মগ্ন থাকিতেন যে, সকলে দেখিয়া বিস্মিত হইতেন। স্বামিজীর উৎসাহ দেখিয়া কেহই মনে করিতে পারিতেন না যে, তিনি শীঘ্রই এই পৃথিবী ছাড়িয়া মহাপ্রস্থানের উদ্যোগ করিতেছেন।

১৯০২ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই। সকালবেলায় উঠিয়া স্বামিজী অন্যান্য দিনের মত সকলের সহিত ধ্যান করিতে গেলেন না। পরদিন শনিবার অমাবস্যা বলিয়া কালীপূজা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তদনুসারে স্বামী শুদ্ধানন্দ ও স্বামী বোধানন্দ নামক শিষ্যদ্বয় পূজার বন্দোবস্ত করিবার ভার লইলেন। স্বামিজী হৃষ্টচিত্তে ধ্যান করিতে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল যে, ঘরের দরজা জানালা সব বন্ধ। সুদীর্ঘ তিন ঘণ্টাকাল ধ্যান করিয়া স্বামিজী নামিয়া আসিলেন এবং "মন, চল নিজ নিকেতনে" গানটি গাহিতে গাহিতে মঠের প্রাঙ্গণে পাদচারণা করিতে লাগিলেন। কিছুকাল পরে স্বামী প্রেমানন্দ দেখিলেন যে স্বামিজী নিজে নিজে কি যেন বলিতেছেন। তিনি মনোযোগ দিয়া

শুনিলেন, স্বামিজী বলিতেছেন, "যদি এখন আর একজন বিবেকানন্দ থাকিত, তাহা হইলে সে বুঝিত বিবেকানন্দ কি করিয়াছে। কালে অবশ্য অনেক বিবেকানন্দ জন্মগ্রহণ করিবে।" স্বামী প্রেমানন্দ বিবেকানন্দের ভাব দেখিয়া চিন্তিত হইলেন, কিন্তু ভগবানের ইচ্ছায় কিছু বুঝিতে পারিলেন না।

স্বামিজী অনেকদিন সকলের সঙ্গে একত্র বসিয়া খাইতেন না। কিন্তু আজ খাওয়ার ঘণ্টা পড়িবামাত্র সকলের মধ্যে যাইয়া বসিলেন এবং নানাবিধ গল্প করিয়া আমোদ করিয়া খাইতে লাগিলেন। খাওয়ার পর কিছুকাল বিশ্রাম করিয়াই ব্রহ্মচারিগণকে ব্যাকরণ পড়াইতে লাগিলেন। তিন ঘণ্টা পড়াইয়া একটু বিশ্রাম করিয়া স্বামী প্রেমানন্দকে লইয়া মঠের বাহিরে বেড়াইয়া আসিলেন।

সন্ধ্যা হইল। আরতির সময় উপস্থিত দেখিয়া মঠের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণ ঠাকুরঘরে চলিয়া গেলেন। স্বামিজী ধীরে ধীরে দোতালায় নিজের শয়নঘরে গেলেন। ঘরে গিয়াই তাঁহার সেবক ব্রহ্মচারীকে সমস্ত জানালা খুলিয়া দিতে বলিলেন। পূর্বদিকের একটা জানালার সম্মুখে দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ গঙ্গা ও দক্ষিণেশ্বরের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। তার পর ব্রহ্মচারীকে ডাকিয়া বলিলেন,

তুমি ঘরের বাহিরে বসিয়া ধ্যান কর, আমি ঘরের মধ্যে ধ্যান করিব। এই বলিয়া তিনি জপমালা হাতে লইয়া ধ্যানে বসিলেন।

ক্রমে রাত্রি নয়টা বাজিল। স্বামিজী ধ্যান শেষ করিয়া মাটিতে মাদুর পাতিয়া শয়ন করিলেন এবং ব্রহ্মচারীকে ডাকিয়া বাতাস করিতে বলিলেন। শুইয়া শুইয়া স্বামিজী জপ করিতেছিলেন। কিছুক্ষণ পর তাঁহার হাত একটু কাঁপিয়া জপ করা থামিয়া গেল, তিনি ঘুমন্ত শিশুর মত একটু কাঁদিয়া উঠিলেন। তার পর বালিশ হইতে তাঁহার মাথা গড়াইয়া পড়িল। বালক ব্রহ্মচারী কোনদিন এরূপ দেখে নাই, সে ভীত হইয়া মঠের বড় সন্ন্যাসী-দের খবর দিল। তাঁহারা তাড়াতাড়ি আসিয়া দেখেন —সব শেষ হইয়া গিয়াছে। বিশ্বপ্রেমিক যোগীবর বিবেকানন্দ পৃথিবীর কাজ শেষ করিয়া মহাসমাধি-যোগে দেহত্যাগ করিয়াছেন।

বাঙলার কর্মযোগী সেবাধর্মের প্রচারক স্বামী বিবেকানন্দের মাত্র ৩৯ বৎসর বয়সে লোকান্তরিত হওয়ার সংবাদে সমগ্র দেশ বিষণ্ণ হইল। পরাধীন জাতির মধ্যে ধর্মে, রাষ্ট্রে, সমাজে সমষ্টি-মুক্তির মহান্ আদর্শ প্রচারক বিবেকানন্দের আবির্ভাব এক স্মরণীয় ঘটনা। যুগে যুগে প্রত্যেক দেশেই

সভ্যতার সঙ্কটকালে যে শ্রেণীর মহাপুরুষ দেখা দেন, মানুষকে অন্যায় বৈষম্য ও দুর্নীতি হইতে মুক্ত হইবার পথ দেখান, বিবেকানন্দ সেই শ্রেণীর মানুষ। মহাপুরুষগণ সমস্ত মানবজাতির কল্যাণের জন্যই জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু যে বিশেষ দেশে তাঁহারা জন্মগ্রহণ করেন, সেই দেশের মানুষের উন্নতির দিকেই তাঁহাদের লক্ষ্য বেশী থাকে। বিবেকানন্দও তাহাই করিয়াছেন। পাশ্চাত্ত্য দেশে তিনি বেদান্তের আদর্শ, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের 'যত মত তত পথ' বা 'সকল ধর্মই সত্য' এই বার্তা প্রচার করিয়াছেন; আর ভারতে প্রচার করিয়াছেন, বিদ্যা দিয়া শিক্ষা দিয়া সাধারণ লোকের মানসিক ও সাংসারিক অবস্থার উন্নতি সাধন করা। অতএব বিবেকানন্দের জীবন ও বলপ্রদ উপদেশ ও উৎসাহ-বাণীতে তোমাদের হৃদয় উদার হউক, বুদ্ধি নির্মল হউক, চরিত্র দৃঢ় হউক; স্বামিজীর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া তোমরাও দেশের মুখ উজ্জ্বল কর।
